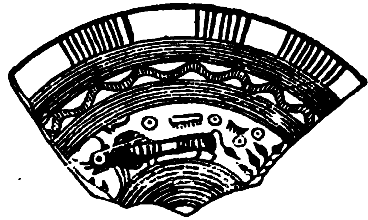
জীবনানন্দস্মৃতি ময়ূখ

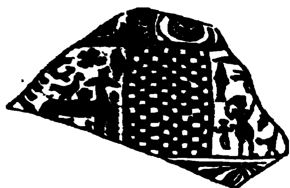
পৌষ—জ্যৈষ্ঠ

১৩৬১-২



এই সংখ্যার সূচী

* * *

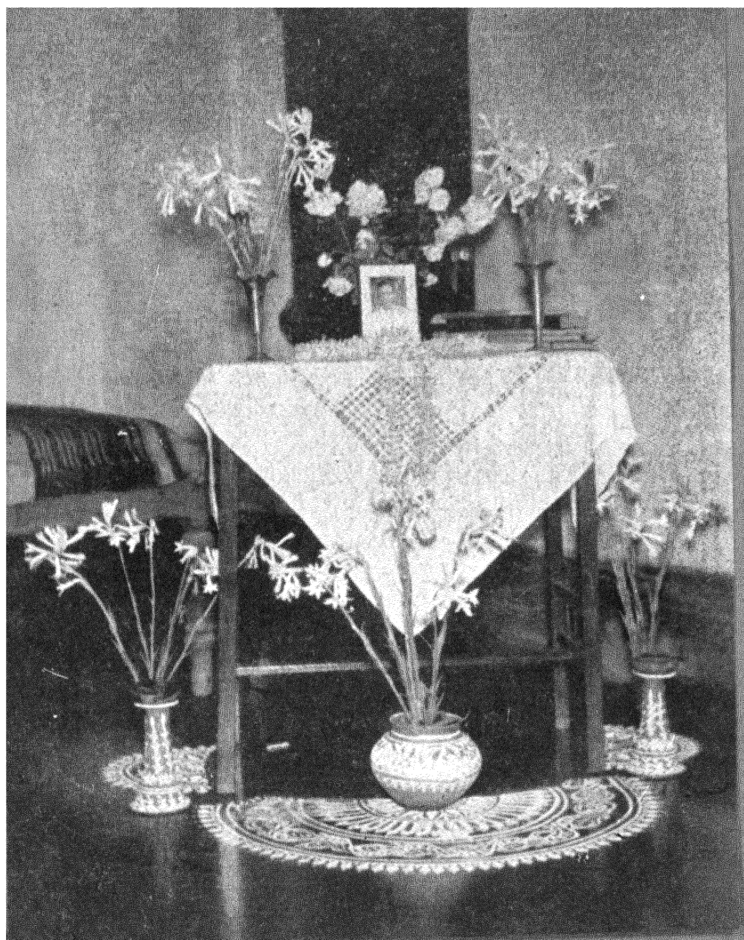


সম্পাদক
জগদীন্দ্র মণ্ডল সমর চক্রবর্তী
প্রকাশক মুদ্রক
সমর চক্রবর্তী
মুদ্রণ
সান্ সাইন প্রেস
৫৯ মির্জাপুর স্ট্রীট কলকাতা ৯
সত্যনারায়ণ প্রেস
২০ গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট কলকাতা ৬
বাঁধাই
আর্যলক্ষ্মী বুক বাইণ্ডিং ওআর্কস্
১০১ বৈঠকখানা রোড কলকাতা ৯

প্রচ্ছদপট : জীবনানন্দের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ
'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র বিশেষ সংস্করণের
প্রচ্ছদের প্রতিলিপি
শিল্পী : শ্রীযুক্ত অনিল ভট্টাচার্য

প্রথম চিত্র-প্রতিলিপির পরিচয় :
৬ই ফাল্গুন : জীবনানন্দের জন্মদিবস
ফটো : সচ্চিদানন্দ রায়

'ময়ূখ' কার্যালয়
২৩।১ চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ) কলকাতা ২৫
দাম দেড় টাকা মাত্র



জীবনানন্দ স্মৃতি ময়ূখ

ঋধক্ সোম স্বস্তয়ে সংজগ্মানো দিবা
কবে। পবস্ব সূর্য্যো দৃশে॥

অচ্ছা কোশং মধুশ্চুতমসৃগ্রং বারে অব্যয়ে।
অবাবশন্ত ধীতয়ঃ॥

অচ্ছা সমুদ্রমিন্দবোঽস্তং গাবো ন ধেনবঃ।
অগ্মন্ন তস্য যোনিমা॥

হে কবি, হে সৌম্য তুমি দীপ্র-প্রজ্ঞা-তেজে
অগ্রসরমান হও দূর-দূরান্তরে
কল্যাণ-স্বস্তির জন্যে, সূর্যের মতোন
দেখাতে সত্যের মুখ, সত্যের আলো॥ ঋগ্বেদ ৯।৬৪।৩০ ॥

অব্যয় তামসাবরণে মধুশ্রাবী
অক্ষয় কোশ উত্তম শৈলীতে
প্রস্ফুট করে, কামনাও করে তা-ই
ধ্যানসমাহিত পুরুষ নির্বিশেষে॥ ঋগ্বেদ ৯।৬৬।২১ ॥

পয়স্বিনী গাভীগণ গৃহে আসে;
সৈশ্বর্য-বিদ্বানগণ নিবিড় রীতিতে
আনন্দ সাগরে আসে, ঋতের যোনিতে॥ ঋগ্বেদ ৯।৬৬।১২ ॥

জীবনানন্দ দাশ

সময় ফুরিয়ে গেলে সব এসে
সময়ের মত
সৌন্দর্য্যেরে ধরে না আদরে
মানুষের মনে
যে সৌন্দর্য্য হয়নাই – তখনো তাহার মত আরো 'না' বলে
আরো 'না' বলে
মুছে ^ সুন্দর যায়
নক্ষত্র নিয়ে যায় — পৃথিবীর সুন্দরতম যা
শেষ হয় — মানুষের ফুল, ফল, বনের পর্বত
মানুষের মনে
যে সৌন্দর্য্য হয়নাই তখনো তাহার মত আর 'না' বলে
আরো 'না' বলে।

এখানে সারাদিন উঁচু ঝাউবন খেলা করে
হলদে সবুজ নীল রং তার বুকে :
কাঁচি[redacted] মেঘ রৌদ্রের;
তবু আজো হৃদয়ের গভীর অসুখে

মানবেরা পড়ে আছে কেন।
আজ অন্ধ শতাব্দীর শতচ্ছিদ্রতার
ভিতরে আলোর খোঁজে যদি চলে যায়
তবুও শাশ্বত হয়ে থাকে অন্ধকার।

নতুন যুগের জন্য তবুও প্রয়াণ করা গেলো।
চিত্রল হরিণ ঐ শিং তুলে ফিকে জ্যোৎস্নায়
হরিণীকে খুঁজে তবু পাবে না কখনও;
ব্যাঘ্রযুগে শুধু মৃত হরিণীর মাংস পাওয়া যায়।

॥ কবিতা দু'টির প্রথমটি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সমসাময়িক ; দ্বিতীয়টি একেবারে সাম্প্রতিক কালের রচনা ; রচনাকালের কোনো নির্দিষ্ট তারিখ পাওয়া যায় নি, কেননা কবিতার নিচে তারিখ লেখার কোনো অভ্যাস কবির ছিলো না। কবিতা দু'টি পাওয়া গিয়েছে কবি-অনুজ শ্রীযুক্ত অশোকানন্দ দাশ-এর কাছ থেকে ; সর্বব্যাপারেই তাঁর কাছে যে-রকম উদার সাহায্য সবসময়ে পেয়েছি আমরা, তার তুলনা নেই ॥

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা

জীবনানন্দ দাশ

একাশী বৎসরে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ হ'ল।

রবীন্দ্রসত্তার সঙ্গে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও বাঙ্গালী জাতি কোনো চিরায়ুষ্মান শরীরে তার মন আত্মার মত যে রকম মিশে রয়েছে, অন্য কোনো একজন ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে তাদের সে রকম মিলন কোনো দিনও হয়নি। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর প্রতিভার বিচিত্র দানের কথা অনেকদিন থেকে আমাদের দেশে ও সমস্ত পৃথিবীতে আলোচিত হয়ে আসছে। কিন্তু আমার মনে হয় আমরা এখনো রবীন্দ্রনাথের আনুপূর্বিক ভাস্বরতার এত বেশী নিকটে যে ইতিহাসের যেই স্থির পরিপ্রেক্ষিতের দরকার একজন মহাকবি ও মহামানবকে পরিস্কার ভাবে গ্রহণ ক'রতে হ'লে, আমাদের আয়ত্তে তা নেই। তৎসত্ত্বেও আমরা অনুভব করি রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাষা, সাহিত্য, জীবনদর্শন ও সময়ের ভিতর দিয়ে সময়ান্তরের গরিমার দিকে অগ্রসর হবার পথ যে রকম নিরঙ্কুশভাবে গঠন ক'রে গেছেন পৃথিবীর আদিকালের মহাকবি ও মহাসুধীরাই তা পারত; ইদানীং বহুযুগ ধ'রে পৃথিবীর কোনো দেশই এ রকম লোকোত্তর পুরুষকে ধারণ করেনি।

আধুনিক বাংলা কবিতা ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমি আমার মতামত ব্যক্ত করতে অনুরুদ্ধ হয়েছি। এ সম্বন্ধে অবশ্য অনেক কথা বলবার ছিল, কিন্তু আজ এই বিশেষ দিনে এ সম্পর্কে দু'একটি কথা ছাড়া

আমি অতিরিক্ত বাগ্‌বিস্তার ক'রতে যাবনা ; রবীন্দ্রনাথ ও তৎপরবর্তী আধুনিক বাংলা কাব্যের থেকে কবিতা বা কবিতার পংক্তিবিশেষ উদ্ধৃত করে এ প্রবন্ধ স্ফীত করবার চেষ্টা আমি করব না।

সকল দেশের সাহিত্যেই দেখা যায় একজন শ্রেষ্ঠতম কবির কাব্যে তাঁর যুগ এমন মানবীয় পূর্ণতায় প্রতিফলিত হয় যে, সেই যুগের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পথে যে সব কবি নিজেদের ব্যক্ত করতে চান, ভাবে বা ভাষায়, কবিতার ইঙ্গিতে বা নিহিত অর্থে সেই মহাকবিকে এড়িয়ে যাওয়া তা'দের পক্ষে দুঃসাধ্য হ'য়ে দাঁড়ায়।

অবশ্য এড়িয়ে যাওয়াটাই আসল কথা নয়; অর্থহীন অসন্তোষে বা দুর্বল বিদ্রোহের অভিমানে আমি আমার পূর্ববর্তী বড় কবিকে ডিঙিয়ে গেলাম অকাব্যের জঞ্জালের ভিতর,—সাহিত্যের ইতিহাসে এ রকম আন্দোলনের কোনো স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি দু'একজন কবির ভিতরে আমরা অরাবীন্দ্রিক সুর পাই বটে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ আধুনিকতার প্রবর্তক নন। তিনি রবীন্দ্র পূর্ববর্তীও নন। তাঁর কবিতায় আমরা অতীত বাংলা কাব্যের দু'একটা বিশিষ্ট লক্ষণের উৎকর্ষ দেখতে পাই। এর চেয়ে বেশী কিছু পাই ব'লে মনে হয়না। আমরা মনস্বী অগ্রজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব এ রকম একটা পরামর্শ এঁটে নতুন কবিরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেনা। প্রত্যেক বিশিষ্ট কবিই তাঁর যুগ ও সমাজ সম্বন্ধে সচেতন থেকে ভাবনাপ্রতিভার আশ্রয়ে যখন কবিতা লিখতে যান, তখন তাঁর কবিতার আঙ্গিক ও ভাষা বিচিত্রভাবে সৃষ্ট হয়,—এমন একটা অপরূপ সঙ্গতি পায় যা তাঁর কবিতায়ই সম্ভব—অন্য কারু কবিতায় নয়। আজকাল বাংলাদেশে যাকে আধুনিক কবিতা বলা

হয়, তার জন্মের ইতিহাস সম্পর্কে যদি উপরের কথাটি প্রয়োগ করতে পারি তবেই তা সার্থক।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার উদয়ের আগে রবীন্দ্রকাব্যের আওতার থেকে বেড়িয়ে পড়বার ছু'একটা প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। সে ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি হচ্ছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার আঙ্গিকের অনুশীলনের জন্যই বিখ্যাত। তিনি (মহৎ কবির নয়, সুকবির) শব্দ ও ছন্দকেই ভালোবেসে গেছেন। তাঁর কবিতায় মননধর্মের অভাব অত্যন্ত শোকাবহভাবে আমাদের আঘাত করে। কিন্তু আঙ্গিকের দিকেও সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম ক'রে যেতে পেরেছেন ব'লে মনে হয়না। বাংলা ভাষায় যুক্ত-অক্ষরের পূর্বস্বরকে যে আমরা গুরু বা ছু'মাত্রায় উচ্চারণ করি, রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দেই তার প্রথম পরিস্কার নমুনা দেখতে পাওয়া যায় সত্যেন্দ্রনাথের আবির্ভাবের অনেক আগে। সত্যেন্দ্রনাথ এই প্রবর্তনাকে প্রয়োগ করে গেছেন তাঁর নানাছন্দে।

রবীন্দ্রোত্তর প্রকৃত আধুনিক কবিতার অভ্যুত্থান হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে। এ কবিতা আধুনিক কি না—এ কবিতা কি না—এ কাব্যে কোনো স্বকীয়তা আছে কি না এ কবিতার বক্তব্য কি—আধুনিক কবিদের বার বার এই সব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। রবীন্দ্র-কাব্যে রয়েছে একটি বিস্তৃত যুগের প্রাণপরিসর এবং এমন অনেক কিছু যা সময়াতীত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই সময়োত্তর কবিতা-গুলোকে এবং সম্পূর্ণ বিভিন্ন কারণে তাঁর গতিশুদ্ধ, প্রখর, জাগ্রত মনের প্রবন্ধগুলোকে যদি বাদ দেই তাহলে দেখতে পাই যে তাঁর

প্রকৃত কাব্যলোকে সমাজ-ও-ইতিহাসচেতনা একটা নির্দ্ধারিত সীমায় এসে তারপর মন্থর হয়ে গেছে। আধুনিকের কবিতা সেই কিনারার থেকে সূত্র তুলে নিয়ে যে ধরণের সমাজ ও ঐতিহ্য বোধের আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে তার পরিচয় রবীন্দ্রকাব্যে পাওয়া যায়না বল্লে উক্তি অসঙ্গত হবে, কারণ রবীন্দ্র-কাব্য বিরাট সমুদ্রের মত—কিন্তু তাঁর শেষ জীবনের কবিতায়ও—'পুনশ্চ' 'রোগশয্যায়' 'আরোগ্য' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থেও এই জিনিষ রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান স্মরণীয় বিষয় নয় ব'লে কবি এর দিকে সম্পূর্ণ মনঃক্ষেপ ক'রতে উদাসীন এবং এর প্রকাশ তাঁর কাব্যে রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বাক্ষর থেকে বঞ্চিত। এইখানেই কোনো কোনো আধুনিকদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অমিল। দৃষ্টিভঙ্গির এই ব্যতিরেকী গতির জন্য আধুনিক বাংলা কবিতার চিন্তা ও ভাষা রবীন্দ্রকাব্যের থেকে পৃথক পথে চ'লতে সুরু ক'রেছে এইটুকু মাত্র ব'লতে পারা যায়। কিন্তু তবুও বাংলার মাটিতে রবীন্দ্রনাথের যুগে এসে যারা ভাবাবেগ ও রোমান্টিসিজম্‌কে সংহত ক'রে কবিতার ভিতরে তীথিকের মত তপঃশক্তি অথবা হোরেসের রীতি অথবা নিজেদের হৃদয়ের ঈষদস্ফুরিত অন্য এক সংহতি আনতে চায় তারা তাকিয়ে দেখে উপরে—নীচে—সম্মুখে রবীন্দ্রকাব্যের অনপনেয় ছায়ায় তাদের স্বাবলম্বনের বিবর্ত্তন চ'লেছে।

আধুনিকেরা তা জেনে নিরুৎসাহ নন। এমন একটা বিড়ম্বিত যুগের শেষে এসে তাঁরা দাঁড়িয়েছেন এবং সম্মুখে এমন গভীরতর কুমন্ত্রণা যে আজ পর্যন্ত তাঁদের সাহিত্য উল্লেখযোগ্য হোক বা না হোক তাঁদের নতুন মনোভাব লক্ষ্য ক'রবার বিষয়। অনেকের ধারণা বর্ত্তমান বাংলা কবিতা মোটা চালে ও গদ্য ছন্দেই চলে ভালো। কিন্তু সে ধারণা

ঠিক নয়। যেখানে আধুনিক কবিতা সূক্ষ্ম সুর বজায় রেখে চ'লছে সেখানে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য আয়ত্তে রাখবার জন্য রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে অজ্ঞাতসারে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর চেতনায় তাকে স্বভাবতই গভীর সংঘর্ষে আসতে হয়েছে। কেননা এ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের নিতান্তই নিজস্ব জিনিষ নিয়ে আধুনিকের বোঝা-পড়া। এই সংঘর্ষে যে আধুনিক কবিতার নিজস্বতা ম্লান হয়নি তাকে বাংলাদেশের বর্তমান কালের অল্পাধিক বিপ্লবাত্মক ভাববাদী কবিতা বলা যেতে পারে। বিপ্লব সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই শুধু নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গোটা পরিপ্রেক্ষিতের মুখে দাঁড়িয়ে এ বিপ্লব পূর্ণতর সমীকরণের চেষ্টায় অর্থাৎ সৃষ্টিরহস্যের নতুনতর অর্থসন্ধানে ব্যস্ত। কাজেই এ সব কবিতার জীবনদর্শন রবীন্দ্রকাব্যের জীবনদেবতাবোধের চেয়ে অন্য জিনিষ। রবীন্দ্রকাব্যের অর্থগৌরবের থেকে এ সব আধুনিক কবিতার নিহিত অর্থ পৃথক হওয়ার দরুণ প্রকাশের ভঙ্গিও স্বভাবতই অন্য রকম হয়েছে। কিন্তু বর্তমান কোনো কোনো কবির পক্ষে এই ধরণের সার্থক কবিতা লেখার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে এই যে গত মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ইংরেজী কবিতার বিরাট ট্রাডিশন ও আমাদের দেশে স্বয়ং রবীন্দ্রের সৃষ্টিরহস্যোৎসারিত বড় কাব্যের পরে নতুনতর বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েও বিশ্ব-রহস্য সম্বন্ধে নতুন দায়িত্বপূর্ণ মহদুক্তি করবার মত ভাবনাপ্রতিভার একান্তই অভাব—স্বদেশ ও বিদেশের আধুনিকদের মধ্যে। বিদেশের আধুনিকেরা এখন সকলেই প্রায় স্বচেষ্টায় বা অচেষ্টায় লোকায়ত ; আমরাও তাদেরই মতন। আমার মনে হয় বাংলাদেশে আধুনিক কালে দু'একটি কবির মুষ্টিমেয় কবিতায় মাত্র কাব্যে বিশ্ববোধ সম্পর্কিত এই দিকটা কিছু পরিমাণে সফল হয়েছে।

আমাদের দেশে যে সব নতুন কবিরা দিব্যানুভূতিকে ঘৃণা করেন এবং স্থূল ও চিক্কণ সুর মিশিয়ে কবিতা লেখেন—পদ্যে বা গদ্যছন্দে তাঁদের কবিতা প্রধানত শ্লেষাত্মক এবং বর্তমান কালের সমগ্র পৃথিবীর সমাজব্যবস্থার অন্যায় ও অত্যাচারের মুখোস বার ক'রে ফেলবার জন্য প্রযুক্ত। রবীন্দ্রনাথও তাই চান, কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন প্রায়শই বিশুদ্ধ কাব্যের আবেগে। কিন্তু এঁদের মনোবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে এইজন্যই বিভিন্ন যে এঁরা সাহিত্যে কল্পনাপ্রতিভার দাবী সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা ক'রে অকাতর ভাবে মননজীবী এবং কবিতায় বিশুদ্ধ রসের কোনোরকম অবতারণার বিরোধী। আধুনিক বাংলা কবিতায় এই সব কবিই গদ্যপ্রায় পদ্যছন্দ অথবা গদ্যছন্দ অবলম্বন ক'রে চলেছেন—এবং বর্তমান সমাজ ও সভ্যতার শববাহনের কাজ চলেছে এঁদের কবিতায়। কিন্তু এসব লেখায় কোনো নতুন আশা ও দীপ্তির পরিচয় পাওয়া গেলে এহেন আধুনিক বাংলা কবিতার উপকার হ'ত,—সে পরিচয় তাঁদের আঙ্গিকে সঞ্চারিত হ'লে পদ্য বা গদ্য শরীরেও কবিতার জন্ম হ'ত—আশা করা যায়।

এই দিক দিয়েও রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে এসব রচনার প্রভেদ এই যে উক্ত কাব্যের সব চেয়ে বেশী বেদনা সব চেয়ে বেশী চেতনারই পরিচায়ক; সমাজ বা ইতিহাসের চেতনার নাম ক'রে এবং কখনো অবচেতনাকে আশ্রয় ক'রে, কখনো বা তাকে ব্যঙ্গ ক'রে তা' পরিণামে ত্রিশঙ্কু হয়ে ঝুলে থাকেনা। কেউ কেউ বলবেন কালের মুকুর হিসেবে সাহিত্যকে মেনে নিলে এই বিচ্ছিন্ন যুগে শুদ্ধ কবিতার কোনো মানে হয়না। কিন্তু সাহিত্যকে যদি যুগের দর্পণ হিসেবেই শুধু স্বীকার ক'রে নেয়া যায়, একটা ক্ষয়িষ্ণু যুগের নির্মম দর্পণ হয়েও

সাংবাদিকী ও প্রচারমর্মী রচনার সঙ্গে কবিতার পার্থক্য এই যে প্রথমোক্ত জিনিষগুলোর ভিতর অভিজ্ঞতাবিশোধিত ভাবনাপ্রতিভার মুক্তি, শুদ্ধি ও সংহতি কিছুই নেই, কবিতায় তা আছে।

আধুনিক বাংলা কবিতার উল্লেখযোগ্য দিকটা'র অভ্যুত্থান হ'ল নতুন সময় তার নতুন দায়িত্ব নিয়ে এসেছে ব'লে। মধুসূদন যেমন বিদেশী সাহিত্যিকদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী, রবীন্দ্রবঙ্কিমও তাঁদের কাছে অল্পাধিক গিয়েছিলেন ; বর্তমান কবিদেরও অল্পবিস্তর পরস্পরনিঃসক্ত বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী তেম্নি বোদেলেয়র ও ফরাসী প্রতীকী কবিদের থেকে সুরু ক'রে ইয়েট্‌স, এলিয়ট ও পাউণ্ডের নিকটে গেল খানিকটা হৃদয়ের সাহচর্য ও কিছুটা অভিনবত্বের গরিমা সে সব জায়গায় খুঁজে পেয়েছে ব'লে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার চর্চা আধুনিক বাঙ্গালী কবির তেমন মন জোগাতনা ; অন্তত যারা আধুনিক বিশিষ্ট বাঙ্গালী কবি রবীন্দ্রনাথকে তারা বিস্পষ্ট সম্ভ্রমে প্রণাম জানিয়ে মালার্মে ও পল ভারলেন, র্‍ঁসার ও ইয়েট্‌স ও এলিয়টের সদর্থক বা নঙর্থক মননবিচিত্রতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর কাব্যলোক থেকে উচ্চারণ করলেন 'এ পাখার বাণী' যেখানে শেষ পর্যন্ত কবিগুরুর অভাবনীয় ভাবনাপ্রতিভা আমাদের জানিয়ে গেল যে 'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ' তখন এ জিনিষকে মর্মান্তিক শ্রদ্ধায় সমসাময়িকতার অসাচ্ছন্দ্যের থেকে ঘুচিয়ে দিয়ে আধুনিকেরা—বর্তমান সময়ের জন্য অন্তত—আধুনিকেরা—গ্রহণ ক'রলেন এলিয়টকে যখন তিনি বলছেন :

In this last of meeting places
We grope together

And avoid speech
Gathered on the beach of the humid river.
Sightless, unless
The eyes reappear
As the perpetual star
Multifoliate rose
Of death's twilight kingdom
The hope only
Of empty men.

আধুনিকদের একটা বিশিষ্ট পক্ষ, এবং অল্পাধিকভাবে সকলেই, মনে ক'রল সমগ্র পৃথিবীর বর্তমান যুগের waste land এর স্থর এলিয়টের মত কে আর ব্যক্ত ক'রতে পেরেছে? কিন্তু কাব্যকে যদি waste land এর যুগের প্রতিবিম্ব হিসেবে গ্রহণ ক'রতে হয়—এই শুধু, এর চেয়ে বেশী কিছু নয়—তাহ'লে এলিয়েটের কাব্য সে রকম বিম্বন বটে—সর্ব সংস্কার মুক্ত হয়ে। বিশেষ সময়চিহ্নের ছাপ তার ওপর এমন জাজ্বল্যমান যে তা আজ না হোক, কাল অন্তত ফিকে হয়ে যাবে।

এলিয়টকে সমর্থন করা হ'ল এবং রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কারু কারু অভিযোগ হ'ল এই যে তিনি ঐশ্বর্যশালী লোক ও জনসাধারণের আন্দোলনের থেকে বিচ্ছিন্ন, তিনি আধ্যাত্মিক সত্যে বিশ্বাসী ও বুর্জোয়া সভ্যতার প্রতীক। এসব ব্যাপার চুলচেরা তর্কেরই জিনিষ বটে। যে সব অসাহিত্যিক তা ক'রবে, তারা তা করুক। আমরা এবং বাংলার ঐতিহ্যের মনীষী ছাত্রেরা আমাদের সমর্থন ক'রে এই কথা বলবে যে রবীন্দ্রসাহিত্য ও কবিজীবন দেশ ও জাতির মেরুদণ্ড গঠন ক'রতে গত পঞ্চাশ ষাট বছর ধ'রে যে ভাবে নিজেকে ক্ষয়িত

ক'রেছে বাংলা ছাড়া অন্য কোনো দেশে হ'লে হয়তো বা তার অপেক্ষাকৃত সুব্যবহার হত। দ্বিতীয় অভিযোগ সম্পর্কে আমরা বলতে পারি যে কাব্যকে কবিমনের সততাপ্রসূত অভিজ্ঞতা ও কল্পনা-প্রতিভার সন্তান ব'লে স্বীকার ক'রে নিলে আধ্যাত্মিক সত্যে বা যে-কোনো সত্যে বিশ্বাস একজন কবির পক্ষে মারাত্মক দোষ নয়— বরং শূন্যবাদের চেয়ে কাব্যসৃষ্টিকে তা ঢের বেশী জীবনীশক্তি দিতে পারে—এবং পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া সভ্যতার ভিতর লালিত হ'লেও তার প্রতীক যে তিনি কখনই নন—বরং আমাদের দেশে সেই সভ্যতার প্রধান ও প্রখর সমালোচক যে তিনিই তা তাঁর জীবন ও পলিটিকস্, তাঁর সমাজসাম্যবাদ ও সাহিত্য দীর্ঘকাল ধ'রে প্রমাণ ক'রে আসছে।

ওদিকে পাউণ্ড ও এলিয়টও বুর্জোয়া সভ্যতার জীব এবং রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কখনই সেই সভ্যতার তীব্রতর সমালোচক নন, আধ্যাত্মিক সত্যে এলিয়টও গভীর বিশ্বাসী, রবীন্দ্রনাথের উপনিষদের তত্ত্বের মত রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম এলিয়টের উপজীব্য এবং তিনিও নিঃস্বের সন্তান বা নিজে নিঃস্ব নন। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রবীন্দ্র-নাথের চেয়ে ঢের বেশী সঙ্কুচিত ও উপেক্ষনীয়। তথাপি আমি দেখেছি, বর্তমান বাংলার কোনো কোনো প্রখ্যাত কবি রবীন্দ্রকাব্যকে মহাসময়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে এলিয়টকে তাঁদের আচার্য ব'লে মনে করেন। কিছুটা নিরাসক্ত ভাবে চিন্তা ক'রে দেখলে এ জিনিষকে ঠিক দোষাবহ বলতে পারিনা তবুও। রবীন্দ্রকাব্যকে আধুনিকেরা— অন্তত আধুনিকদের একটা উৎকৃষ্ট পক্ষ সজাগভাবে বিস্রস্ত হ'তে দিলেও অবচেতনায় তাঁরই কাব্যে বরাবর অনুভাবিত হয়ে এসেছে।

আমরা বিশ্লেষণ করতে বসিনি যে রবীন্দ্রকাব্য থেকে যা আমরা পেলাম তা নিসর্গের শোকাবহ প্রাচুর্যে আসে বলেই সদাসর্বদা আকৃষ্ট করেনা, কিন্তু ঊনবিংশ শতকের ইয়োরোপীয় প্রতীকী কবি কিংবা তাঁদের ইংরেজ কবিশিষ্যদের কাব্য-আকুতির চেয়ে তা যেমন নিরাময় তেম্নি মূল্যবান—রবীন্দ্রনাথের মহত্তর ব্যক্তিত্বের সংশ্লেষ তাতে রয়েছে বলে।

তবুও আধুনিক কালের ভাব ও চিন্তাবৈষম্যের হেঁয়ালির ভিতরে পড়ে ক্ষয়িষ্ণুতার সুর আধুনিকদের স্পর্শ করেছে বেশী। দু'একজন কবির কিছু কিছু কবিতা ছাড়া আধুনিক বাংলা কবিতায় ভঙ্গুরতার ছাপ এমন দেদীপ্যমান যে মুহূর্তের জন্যও রবীন্দ্রনাথের যে-কোনো কবিতা বা গানের সংস্পর্শে এলে মনে হয় তাঁর সঙ্গে আধুনিকদের আদর্শগত বিসদৃশতা কি ভয়াবহ ভাবে চমৎকার! আমাদের দিক থেকে এই বিষমানুপাতিক গতির প্রয়োজন ছিল বল্লেই চলবেনা, বর্তমান সমাজ ও ইতিহাসের দিক দিয়ে এ বিষমতা দুরতিক্রমা হয়ে উঠেছে—কোনো মৃদুকম্পিত আধুনিকও তা এড়াতে পেরেছে ব'লে মনে হয়না।

কিন্তু সমাজ ও ইতিহাস ক্ষয়িষ্ণুতা দোষে দুষ্ট হ'লেও কবিতা ও সাহিত্য তার ভিতরে লালিত হয়েও যদি তাকে প্রয়োগপ্রতিভার শেষ বৈচিত্র্যে কোনো না কোনো একরকম সঞ্চার, ইঙ্গিতের দিব্যতা না দিতে পারে তাহ'লে তা শ্লেষ বা ধ্বংশ বা গঠনাত্মক গুরুতর প্রবন্ধ বা প্রচারপত্র হতে পারে, কিন্তু তাকে কাব্যসৃষ্টি বলা যেতে পারে না। আমাদের দেশে আজকাল অনেক কবির কবিতাই প্রচারপত্রিকায় পর্যবসিত হয়েছে—অন্যপক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনে এই ক্ষয়িষ্ণুতার যুগ ও সুরকে অন্তর্গ্রথিত ক'রে কাব্য রচনা করে গেছেন।

অবশ্য আমি আধুনিকদের সব কবিতাকেই ভঙ্গুর বা প্রচারবিষয়ী বলছিনা। আমাদের দেশেও রবীন্দ্রপরবর্তীদের ভিতর এই সব নির্মাণ ও সৃষ্টির দ্বন্দ্বের ভিতর থেকে বার হয়ে আসছে সার্থকপ্রায় কবিতা, দু'চারটে সফল কবিতা।

তাহ'লে একথা বাস্তবিকই বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সাহায্য ও ইঙ্গিত পেয়ে আজ যে আধুনিক কাব্যের ঈষৎ সূত্রপাত হয়েছে তার পরিণাম বাংলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের ভিত্তি ভেঙ্গে ফেলে কোনো সম্পূর্ণ অভিনব জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে সাহিত্যের ইতিহাস এ রকম অজ্ঞাতকুলশীল জিনিষ নয়। ইংরেজ কবিরা যেমন যুগে যুগে ঘুরে ফিরে সেকস্‌পীয়রের কেন্দ্রিকতার থেকে সঞ্চারিত হয়ে বৃত্ত রচনা ক'রে ব্যাপ্ত হ'য়ে চ'লেছে আমাদের কবিরাও রবীন্দ্রনাথকে পরিক্রমা ক'রে তাই করবে,—এই ধারণা প্রত্যেক যুগসন্ধির মুখে নিতান্তই বিচারসাপেক্ষ ব'লে বোধ হ'লেও অনেককাল পর্যন্ত অমূলক বা অসঙ্গত ব'লে প্রমাণিত হবেনা,— এই আমার মনে হয়।

অন্তরঙ্গ জীবনানন্দ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নির্জন নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ ধূসর স্তিমিত অবসন্ন—এমনিধারা বিশেষণে সাজিয়ে এ-ই এত দিন বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে জীবনানন্দ মিশুক নয়, ঠোঁটে আঁকা মৃদু হাসির বাইরে সে হাসতে জানে না, গা ঢেলে আড্ডা দিতে জানে না, রাস্তায় পরিচিত লোক দেখলেই পাশ কাটিয়ে সরে পড়ে। একদল লেখককে বলতে শুনেছি জীবনানন্দ জীবন থেকে পালিয়েছে, আরেকদল বন্ধুদের মুখে কথা, মানুষ থেকে। যেন তৃণতরুশূন্য বালির চরের ধারে জনশূন্য নৌকো বাঁধা। অবিশ্যি সূর্যের খাড়া আলোর ঝাঁজে এসে সে দাঁড়াতে চায়নি, কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসা দূরের কথা, ডিঙ্গি মেরেও দাঁড়ায়নি গলা বাড়িয়ে। এবং খড় বাঁধবার জন্যেই যে ফের খড় দরকার তা সে খুঁজতে যায়নি কোনো ধানকাটা মাঠে। কিন্তু তাই বলে সে মনের অজ্ঞেয় ছায়াময় প্রান্তেই বাস করে গেছে এমন নয়। এমন নয় যে সে সাংসারিক অনুপাতেই সহজ-উচ্ছল ছিল না, এমন নয় যে সে তুলতে পারত না উচ্চ হাসির নান্দীরোল। এমন নয় যে সে ছিল না প্রবলপ্রাণ বন্ধু, সুদূর থেকে জীবনের ধ্বনি-পাঠানো সমর্থতম সুহৃদ। আসলে মনের মানুষ, মনের মতন মানুষকেই খুঁজে ফিরছি আমরা, কখনো আভাসে-ইসারায় সে আলাপী চাহনিটি ভেসে এলেই সাড়া দিই, রক্তের রাখীবন্ধন হয়ে যায়, আবার যে মুহূর্তে ঔদাসীন্যের রোদ এসে পড়ে চোখের পাতাদুটি বুজে আসে আবার পরিচিত সুর শুনে সুপ্তোত্থিত হবার জন্যে।

জীবনানন্দের জীবন থেকে একগুচ্ছ রঙিন মুহূর্ত আমি আহরণ করে রেখেছি। কটি অন্তরঙ্গ রত্নকণা। সেটা তখন কল্লোলের দিন। কল্লোলের মতই দুর্বার ছিলাম যার জন্যে শান্ততম জীবনানন্দও খিল দিয়ে রাখতে

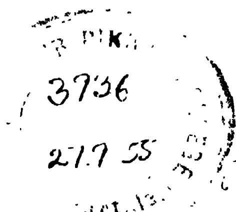
পারেনি দরজায়! ঢেউ যখন শুষ্ক মাটির উপর আছড়ে পড়ে ঢেউও কিছু নিয়ে যায় মাটির থেকে। মাটির আর্দ্রতার সঙ্গে ঢেউয়ের উত্তালতার সৌহার্দ্য হয়। মাটির কাছেই ঢেউ তার মৌনের প্রধান দীক্ষা নেয়। তার সমস্ত উত্তালতার অন্তরে থেকে যায় একটি অনাহত নীরবতা। অন্তরের গহনগোপন মহারহস্য আবিষ্কার করতে হলে মাঝে মাঝে এসে বসতে হয় সমুদ্রের তীরে কিংবা খোলা আকাশের নিচে। আমাদের জীবনে জীবনানন্দই সেই সমুদ্রতীর, সেই অনবরুদ্ধ দীপ্ত আকাশ।

এক টুকরো নীলিমার মত একটি কবিতা উড়ে এসে পড়ল কল্লোলে। লেখক শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ঠিকানা? এক ডাকেরও পথ নয়। মাঝখানে বৈধতার চৌকাঠকে অটুট রেখে হৃদয়ের কারবার করতে হবে কল্লোলের সে মন্ত্র ছিল না। বিনা সই-সুপারিশে সটান হাজির হলাম তার মেসে। দরজায় ধাক্কা দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই হৃদয়ের কপাটও খুলে গেল। শুধু খুলে গেল বললে পুরো বলা হবে না। খোলার মধ্যে আবার বন্ধ হবার সঙ্কেত আছে। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। নিরবকাশ হয়ে গেল। যুদ্ধের বছর দুই ছাড়া প্রায় দুই যুগ বাঙলা দেশের মফস্বলে ঘুরেছি, কিন্তু যখনই স্মৃতিভারমধুর মন হাঁটতে চেয়েছে গত দিনের ছায়াঢাকা পথে তখন জীবনানন্দকেই যেন বেশি ক্ষণের সঙ্গী বলে টের পেয়েছি। জীবনানন্দেই যেন পেয়েছি বেশি আস্থা, বেশি অমলতা। কৃত্রিম সংসারসাফল্যের ঔদ্ধত্য তো ছিলই না, ছিলও না প্রতিভা-পাণ্ডিত্যের দুর্বিনয় কাঠিন্য, বিন্দুমাত্র কবিতার কৃপণতা। যেন তাকে দেখলেই, তার কথায়, দিগন্তপ্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে ভরে যাব। দেখতে পাব শিশুর ভরাট শুভ্রতা, ছুঁতে পাব মাঠভরা সিক্ত ঘাসের লাবণ্য, শুনতে পাব তরল জলের আদরভরা শীতলতা। 'অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ' ছাড়া যাদের আর কোনো সাধ নেই তাদেরও প্রতি তৃপ্তিময় ক্ষমা। শান্তির মধ্যেও যে উত্তেজনা আছে উদ্দীপ্তি আছে,

সহিষ্ণুতার মধ্যেও যে সূক্ষ্ম বিহ্বলতা তা যেন জীবনানন্দেই সুতীব্র। দেখা নেই, দেখার দরকার হয় না, দেখার অতীত রূপে সে প্রত্যক্ষ। এক পথে আর হাঁটা-চলা নেই, তবু মনে হয় পাশাপাশি চলা ছাড়া আর পথও নেই। জিগগেস করেছিলাম, কি মানো? ভেবেছিলাম হয়তো বলবে, ঈশ্বর মানি। মৃদু হেসে বললে, মানুষের নীতিবোধ মানি। বললাম, ও একই কথা। মানুষের নীতিবোধ যা ঈশ্বরও তাই। বড় কথাটাকে সন্নিহিত করবার জন্যে সঙ্কিপ্ত করা। জীবনানন্দ দাশগুপ্তকে বন্ধু বলে ডাকা।

তখনকার দিনে আমাদের অবস্থা, ছাতাও নেই মাথাও নেই। আর জীবনানন্দ সিটি কলেজের অধ্যাপক, রোজগার করে, দস্তুরমাফিক 'অজর অক্ষর সুগম্ভীর' হবার কথা, কিন্তু, কি আশ্চর্য, একই মন যেন জলের মত ঘুরে-ঘুরে দুজনের বুকের মধ্যে একা-একা কথা কয়ে উঠেছে। জল যখন একই তখন একা-একা কথা কওয়াও একই কথা। দুজনে বেড়াতে গিয়েছি চৌরঙ্গি ছাড়িয়ে গড়ের মাঠের দিকে, মাঝে ইণ্ডোবর্মায় চা-চপ-কাটলেট খেয়ে নিয়েছি, জীবনানন্দই খাইয়েছে। এক-এক দিন বা তার পিছু নিয়ে তাকে ধরে ফেলেছি রেস্টোরেন্টে, তাকে চমকে দিয়েছি তার পাশে বসে। সুপ্তোত্থিত শিশুর মত সহাস্য মুখে আমন্ত্রণ করে নিয়েছে। রূঢ় হস্তক্ষেপ করে ভাগ বসিয়েছি তার খাবারের প্লেটে। তার হৃদয়ের ভাঁড়ারে। হস্তক্ষেপ রূঢ় কিন্তু যে স্বাদু খাদ্য কেড়ে নিয়েছি তার নাম মমতা, অফুরন্ত মমতা। বিনিময়ে কিছু দিতে পারছি কিনা তার হিসেব করিনি। এ যেন 'আমরা দুজনে মিলে শূন্য করে চলে যাব জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।'

আরো কতবার টুকরো-টুকরো দিনে খুচরো-খুচরো দেখা হয়েছে তার সঙ্গে। তার স্বপ্নময়তাকে ভাঙতে গিয়ে নিজেই তার ছোঁয়াচ নিয়ে এসেছি। সাংসারিক জিজ্ঞাসার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি তার মহাজিজ্ঞাসার



মুখোমুখি। 'অন্ধকার সনাতনে ডুবে যাওয়া কিন্তু মরণের ঘুম নয়।' আরো একবার তার হৃদয়ের কাছে স্তব্ধ বোঝাপড়ায় ঘন হই যখন প্রায় দশ বছর আগে নদীনালার দেশে বরিশালে তার বাড়িতে এসে উঠি একবেলার কটি বৃষ্টিভেজা সবুজ মুহূর্ত হাতে নিয়ে। মনে আছে আর-আরদের সঙ্গে দুটি তরুণ লেখকও সেদিন আমাদের ঘিরে বসেছিল—অরবিন্দ গুহ আর আবুল কালাম শামসুদ্দিন। একটা সভামতন হয়েছিল কোথায়। চিরদিন যে সভাসমিতিকে এড়িয়ে গেছে তাকে সেদিন নিয়ে গিয়েছিলাম দলের মধ্যে, যতদূর মনে পড়ে প্রাণখোলা প্রচুর হাসি সে সেদিন ছড়িয়ে দিয়েছিল মুঠো মুঠো। যদিও, যতদূর জানি, সিগারেট খেত না, সেদিন কিসের আনন্দে ছেলেমানুষের মত পাখির মতন ঠোঁটে টেনেছিল একটা সিগারেট। সে সব কথা অরবিন্দর ভালো মনে থাকবার কথা। আমাকে একবার বলেওছিল অরবিন্দ সে কাহিনী সে লিখবে। হয়তো লিখেছিল কিন্তু ছাপতে পারেনি।

সেদিন বরিশালের নদী, ঘাসভরা মাঠ, ঝাউ গাছ, বেতবন, লাসকাটা ঘর, স্টিমারের জেটি, মশামাছি পেঁচা ইঁদুর—সব মিলিয়ে জীবনানন্দকে যে অনুভব করেছিলাম সেটিই তার মৃত্যুর পরেকার অদ্ভুত অন্ধকারে অন্তহীন নক্ষত্রের আলো ফেলে জেগে রয়েছে, থাকবে।

তারপর আসানসোলে আচমকা তার একটা চিঠি চলে আসে।

১৮৩ ল্যান্সডাউন রোড
কলকাতা ২৬
১০. ৫. ৪৯.

ভাই অচিন্ত্য,

তোমারই জয়।

আমি ভেবেছিলাম তুমি ক্ষুণ্ণ হয়ে আছ। এখন মনে হচ্ছে তুমি তোমার ঠিক জায়গায়ই আছ। তোমার সঙ্গে আমার হৃদ্যতা কত গভীর তা তুমিই জান ; মাঝে মাঝে আমরা তুজনে সেটা একটু আধটু ঘুলিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু অন্তঃশীল অমলতা ঠিকই আছে। স্বভাবতই মন তোমার দিকে আমাকে টানে—দূরে থাকলে বেশি টানে। কাছে এসে পড়লে তোমার জিজ্ঞাসা ও দৌরাত্ম্যের জের—মাঝে মাঝে সেটা রূঢ়ও বটে—সেই জের দেখে টের পাই সাংসারিক সফলতা ও গল্পকথকের মালমশলায় তুমি সত্যিই বেশ তুর্ব্বার, আজকাল তো দস্তুরমত সার্থক। কিন্তু আন্তরিকতা ও স্নিগ্ধতায় কারো চেয়েই কম নও। তোমার কাছে গেলে তোমাকে আমি সব সময় ঠিক ভাবে গ্রহণ করতে পারি না, (সেটা আমারই দোষ),—কিন্তু দূর থেকে তোমার মন খাঁটি শাঁসের মত এসে দেখা দেয় আমার কাছে ; বুঝতে পারি এই আশ্চর্য অচিন্ত্য ফলের এইটেই ঠিক স্বরূপ। খুব ভালো হত কাছেও যদি তোমাকে ঠিক ওরকম ভাবে পেতে পারতাম। তা হলে আজকের সাহিত্যিকদের ভেতর শুধু তোমার মত তু একটি বন্ধুকে নিয়ে জীবনের বহিরাশ্রয়ের ভূমিতে খুব চরিতার্থতা পাওয়া যেত।

'কল্লোলের যুগে' এত লোককে তুমি বুকে জড়িয়ে ধরছ, প্রাণ খুলে

শিরোপা দিয়ে দিচ্ছ—দেখে মন ভরে ওঠে। যত দিন কেটে যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি হৃদয় দিয়ে সাহিত্য শিল্প তৈরি ক'রে—জীবনের ব্যাপারেও তেমনি উষ্ণতার বেশ সুখস্পর্শ আঁচ দিচ্ছ পুরোনো কথা স্মরণ করতে গিয়ে।

মনোলোকে যা আছে তা আছে—বাইরের পৃথিবীতেও তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বে সিদ্ধির স্তরে পৌঁছে যেতে পারতাম যদি এক আধটা বাধা (আমারই দোষ) জিনিষটাকে কিছু কিছু খণ্ডিত করে না ফেলত।

কল্লোলের সেই ঘরটায় আমি দু চারবার নয় দুশো বার তো গিয়েছি খুবই; তুমি বিকেলের দিকে আসতে—আমি সকালের দিকে যেতাম। দীনেশরঞ্জনকে সব সময়েই দেখতাম, মাঝে-মাঝে নৃপেন থাকত। তুমি Presidency Boarding এ প্রায়ই আসতে—বেড়াতে বেরুতাম তারপর—চৌরঙ্গীর দিকে প্রায়ই। অনেক কথা মনে পড়ছে—অনেক অনবলীন দিন মাস মুহূর্তের।

দেড় বছর আগে তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল। তারপর কলকাতায় আসছ যাচ্ছ; কখন আস কখন চ'লে যাও খবরও পাই না। এক আধবার আমার এখানে উঁকি মেরে গেলে খুশি হব, কিংবা আমাকে জানালে তোমার বাড়িতে গিয়ে দেখা করে আসতে পারি। আসানসোলের ঠিকানায় তোমাকে লিখছি: সেখানে এখনও আছ না বদলি হয়েছ জানি না।

আশা করি ভাল আছ। ভালবাসা জানাচ্ছি। ইতি

তোমার জীবনানন্দ

আরো একটা চিঠি :

১৮৩ ল্যান্‌স্‌ডাউন রোড
কলকাতা ২৬
১৩. ৬. ৪৯.

ভাই অচিন্ত্য,

কয়েকদিন হল তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি। আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল ; অন্য নানা কাজে অকাজেও ব্যস্ত ছিলাম, কাজেই চিঠির উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেল।

তোমাকে চিঠি লিখতে লিখতে আমার বরিশালের সেই সব দিনের কথা মনে পড়ছে যখন তোমাদের একটার পর একটা চিঠি হাতে আসত, উত্তর দিতাম, প্রত্যাশা করতাম। তখনকার দিনের বরিশাল আজকের চেয়ে প্রায় সব দিক দিয়েই ভালো ছিল।

আমি তোমাকে ভুল বুঝিনি ; ঠিকই আছে সব ; এর আগের চিঠিতে তোমাকে লিখেছি, তোমার চিঠিও প'ড়ে দেখেছি— সবই যথাস্থানে আছে—ভালোই আছে।

আমি বিশেষ কোনো কাজ করছিনা আজকাল। লিখে, পড়িয়ে, অল্পস্বল্প রোজগারে চলে যাচ্ছে। একটা চাকরীর জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম, reference চেয়েছিল—তার ভেতর তোমার নামও দিয়েছি ; ও সব চাকরী হবেনা। সব ছেড়ে দিয়ে শুধু লিখে যেতে পারলে ভালো হত। সেটা অনেকদিন থেকেই সম্ভব হচ্ছে না। কলকাতায় এলে দেখাসাক্ষাৎ হবে। আশা করি ভালো আছ। ভালোবাসা জানাচ্ছি।

তোমার জীবনানন্দ

জীবনই দূরে ঠেলে দেয়, মরণ কাছে নিয়ে আসে। জীবনের ছোট-ছোট কুশকণ্টকের আঘাতে জীবনানন্দ বিক্ষত ছিল কিন্তু তার ঊর্ধ্বে একটা বড় দুঃখের সুখের জন্যেই তার বলিষ্ঠ মনের নৌযাত্রা। সেই বড় দুঃখের অপ্রমত্ত আনন্দেই ছোট দুঃখের দংশনগুলি ঘুমিয়ে ছিল। 'অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে রয়ে গেছে অমোঘ আমোদ।' সুখের অতৃপ্তির পরিবর্তে এই অমোঘ আমোদেই জীবনানন্দ বীর, চরিতার্থ।

কলেজের ছেলেরা সভা করতে চেয়েছিল, বলেছিল ছুটি চাই, বাঙলার অধ্যাপককে বললে, আপনি সভাপতি। কিসের সভা? জীবনানন্দের জন্যে শোকসভা। কে জীবনানন্দ, সরাসরি বলতে পারতেন অধ্যাপক, কিন্তু ভালো শোনাত না। তাই বললেন, আমি যে ওঁর লেখা কিছু পড়ি নি। না-পড়েছেন না-পড়েছেন, জীবন ও আনন্দ সম্বন্ধেই বলবেন না-হয় কিছুক্ষণ।

কিছুক্ষণ নয়, সমস্ত ক্ষণ। জীবনানন্দ সেই জীবন ও আনন্দের সমাচার। তার চেয়েও বড় কথা, জীবন ও আনন্দের সমাহার।

জীবনানন্দ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

কবিতা লেখকের রূপে যাঁরা মুগ্ধ হতে চান আমি সে-দলের নই বলে' জীবনানন্দ দাশকে প্রথম দেখতে গিয়ে বিরূপ-বিরস মনে চুপচাপ বসে ছিলাম না। তিনি দেখতে রবীন্দ্রনাথের বা নজরুলের মতো সুপুরুষ নন, খবরটা পূর্ব্বাহ্নেই জেনে নেওয়া হয়েছিল। দুপুরের পর টালিগঞ্জের একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। তিনিও তখন একজন বন্ধুসহ বাড়ি ফিরছিলেন—হয়ত কোথাও ভদ্রতা-রক্ষা করে এলেন। তারপর সুরু হল আমার সঙ্গে তাঁর আন্তরিকতার বিনিময়। চা-মিষ্টি খাওয়াতে তিনি এতো ব্যস্ত আর বিব্রত হয়ে পড়লেন 'নিরুক্ত'-পত্রিকার সহকারী সম্পাদককে যে আমার মুখর অভ্যাস যেন স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। আমি তাঁর মুখে অতিথিসেবায় অনভ্যস্ত গৃহিনীর লজ্জাভাস দেখতে পেলাম। 'নিরুক্ত' নিকট ও নিশ্চিত কবিতার প্রতিশ্রুতি পাঠকদের জানিয়ে, রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ শিরে বহন করে', প্রেমেনবাবুর আর অচিন্ত্যবাবুর প্রগাঢ় ইচ্ছাপূত হয়ে ত্রৈমাসিক কবিতা-পত্রিকা হিসেবে বেরুচ্ছিল—সম্পাদক ছিলেন প্রেমেনবাবু।

জীবনানন্দকে আমি পুরুষোত্তম চেহারায় কল্পনা না করলেও অন্তত:পক্ষে 'যুবনাশ্বে'র চেহারায় কল্পনা করে এসেছি। যুবনাশ্ব বা মনীশ ঘটকের চেহারা আমার কল্পনায় কল্লোল-যুগের যশস্বী লেখকদের রূপ পরিবেশণ করত। অচিন্ত্যবাবুকে যেমন ভেবেছি তেমনই দেখেছি—প্রেমেনবাবুকে যেমন ভেবেছি তেমন দেখিনি; তাঁকে গোড়ায় মিশুকই ভাবতে পারিনি, অথচ পরে দেখেছি, অচিন্ত্যবাবুর চাইতেও তিনি বেশি মিশুক-প্রকৃতি। জীবনানন্দ মিশতে গিয়ে সেদিন যেন তাঁর অমিশুক প্রকৃতিকে মনে-মনে ধিক্কার দিচ্ছিলেন। হয়ত ভাবছিলেন তাঁর আন্তরিকতার ত্রুটী আবিষ্কার করে আমি তাঁর হাত থেকে নেওয়া মিষ্টিগুলো খেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করছি। যেন, দানের পেছনে

যে-মন থাকে তাতে আমি খুঁত খুঁজে পেয়েছি সাবেক কালের ভটচায-বামুনদের মতো। ওই মিষ্টিগুলো যে আমি খেতে আসিনি, এ-সহজ কথাটা বলতেও সংকোচ হচ্ছিল ; অথচ প্রথম দিনের দেখায় ওগুলোকে বর্জন করাটাও মেনে নিচ্ছিলনা মন। তাই কোনোপ্রকারে বস্তুগুলো গলাধঃকরণ করে' আমি আলাপের ভারে তৈরী হলাম। অবশ্য সে-আলাপ তিনি শুনলেন না। আমি কবির দিকে তাকিয়ে তাঁর 'বনলতা সেন' কবিতার কয়েকটি পংক্তি মনে-মনে আবৃত্তি করে ভাবলাম : উনি যদি একবার এই কবিতাটি আবৃত্তি করে বোঝাতেন যে কী অনুভবের যাতনায় এমন একটা বিষণ্ণ কবিতা লেখা হল ! যেহেতু তিনি অন্তর্য্যামী নন, তাই আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ হল না—আলগা-আলগা কথায় এটা-ওটা জিজ্ঞাসায় আলাপ আর সেদিন জমল না।

যেমি জীবনানন্দের চেহারা ছিল তাঁর লেখায় তেমি আলাপও ছিল ওখানে। চিঠিতে অনেক বেশি অন্তরঙ্গ কবি ছিলেন তিনি। তাঁর চিঠি পেলে মনে হত, সব সময় তিনি কবিতার কথা ভাবেন। এমন ত কেউ ভাবেন না—রবীন্দ্রনাথেরও অন্যান্য ভাবনা আছে—কিন্তু কবিতার দুর্ভাবনা ছাড়া কি এই ব্যক্তিটির ভাববার মতো আর কোনো বস্তু নেই ! ভাবতাম জীবনানন্দের চিঠি পড়তে পড়তে। কাব্যিময় চিঠি নয়—কবিতা-বস্তুটির জন্যে চিন্তা ও উৎকণ্ঠা থাকত তাঁর চিঠিতে। কবিতা-আন্দোলনের নানা অধ্যায়ে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তাঁর বাড়িতে, রাস্তায়, আমার অফিসে, ঘরে—সব সময়ই অবলীলায় কাব্যের বস্তু-তত্ত্ব আলাপে ঢুকে গেছে। প্রকাশিতব্য বিষয় সম্পর্কে কে কতোটুকু আন্তরিক, তিনি এ-প্রশ্ন আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করেছেন। বানিয়ে কথা বলার বেনিয়া-যুগে আমি তাঁর প্রশ্নের কী উত্তর দেব ? আমি কী করে বা জানতে পারি, সে উত্তর কেমন হবে ? অনেক সময়ই তাই চুপ থেকে বলতে হয়েছে : "আপনি সব চাইতে ভালো লিখ্‌ছেন।"

"ভালো ?" মৃত্যুর দু'মাস আগেও তিনি চোখ টিপে আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন।

জীবনানন্দ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

কবিতা-লেখকের রূপে যাঁরা মুগ্ধ হতে চান আমি সে-দলের নই বলে' জীবনানন্দ দাশকে প্রথম দেখতে গিয়ে বিরূপ-বিরস মনে চুপচাপ বসে ছিলাম না। তিনি দেখতে রবীন্দ্রনাথের বা নজরুলের মতো সুপুরুষ নন, খবরটা পূর্ব্বাহ্ণেই জেনে নেওয়া হয়েছিল। দুপুরের পর টালিগঞ্জের একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। তিনিও তখন একজন বন্ধুসহ বাড়ি ফিরছিলেন—হয়ত কোথাও ভদ্রতা-রক্ষা করে এলেন। তারপর সুরু হল আমার সঙ্গে তাঁর আন্তরিকতার বিনিময়। চা-মিষ্টি খাওয়াতে তিনি এতো ব্যস্ত আর বিব্রত হয়ে পড়লেন 'নিরুক্ত'-পত্রিকার সহকারী সম্পাদককে যে আমার মুখর অভ্যাস যেন স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। আমি তাঁর মুখে অতিথিসেবায় অনভ্যস্ত গৃহিনীর লজ্জাভাস দেখতে পেলাম। 'নিরুক্ত' নিকট ও নিশ্চিত কবিতার প্রতিশ্রুতি পাঠকদের জানিয়ে, রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ শিরে বহন করে', প্রেমেনবাবুর আর অচিন্ত্যবাবুর প্রগাঢ় ইচ্ছাপূত হয়ে ত্রৈমাসিক কবিতা-পত্রিকা হিসেবে বেরুচ্ছিল—সম্পাদক ছিলেন প্রেমেনবাবু।

জীবনানন্দকে আমি পুরুষোত্তম চেহারায় কল্পনা না করলেও অন্ততপক্ষে 'যুবনাশ্বে'র চেহারায় কল্পনা করে এসেছি। যুবনাশ্ব বা মনীশ ঘটকের চেহারা আমার কল্পনায় কল্লোল-যুগের যশস্বী লেখকদের রূপ পরিবেশণ করত। অচিন্ত্যবাবুকে যেমন ভেবেছি তেমনই দেখেছি—প্রেমেনবাবুকে যেমন ভেবেছি তেমন দেখিনি; তাঁকে গোড়ায় মিশুকই ভাবতে পারিনি, অথচ পরে দেখেছি, অচিন্ত্যবাবুর চাইতেও তিনি বেশি মিশুক-প্রকৃতি। জীবনানন্দ মিশতে গিয়ে সেদিন যেন তাঁর অমিশুক প্রকৃতিকে মনে-মনে ধিক্কার দিচ্ছিলেন। হয়ত ভাবছিলেন তাঁর আন্তরিকতার ক্রটী আবিষ্কার করে আমি তাঁর হাত থেকে নেওয়া মিষ্টিগুলো খেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করছি। যেন, দানের পেছনে

যে-মন থাকে তাতে আমি খুঁত খুঁজে পেয়েছি সাবেক কালের ভটচায-বামুনদের মতো। ওই মিষ্টিগুলো যে আমি খেতে আসিনি, এ-সহজ কথাটা বলতেও সঙ্কোচ হচ্ছিল; অথচ প্রথম দিনের দেখায় ওগুলোকে বর্জ্জন করাটাও মেনে নিচ্ছিলনা মন। তাই কোনোপ্রকারে বস্তুগুলো গলাধঃকরণ করে' আমি আলাপের ভাবে তৈরী হলাম। অবশ্য সে-আলাপ তিনি শুনলেন না। আমি কবির দিকে তাকিয়ে তাঁর 'বনলতা সেন' কবিতার কয়েকটি পংক্তি মনে-মনে আবৃত্তি করে ভাবলাম: উনি যদি একবার এই কবিতাটি আবৃত্তি করে বোঝাতেন যে কী অনুভবের যাতনায় এমন একটা বিষণ্ণ কবিতা লেখা হল! যেহেতু তিনি অন্তর্য্যামী নন, তাই আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ হল না—আল্‌গা-আল্‌গা কথায় এটা-ওটা জিজ্ঞাসায় আলাপ আর সেদিন জমল না।

যেমি জীবনানন্দের চেহারা ছিল তাঁর লেখায় তেমি আলাপও ছিল ওখানে। চিঠিতে অনেক বেশি অন্তরঙ্গ কবি ছিলেন তিনি। তাঁর চিঠি পেলে মনে হত, সব সময় তিনি কবিতার কথা ভাবেন। এমন ত কেউ ভাবেন না—রবীন্দ্রনাথেরও অন্যান্য ভাবনা আছে—কিন্তু কবিতার দুর্ভাবনা ছাড়া কি এই ব্যক্তিটির ভাববার মতো আর কোনো বস্তু নেই! ভাবতাম জীবনানন্দের চিঠি পড়তে পড়তে। কাব্যিময় চিঠি নয়—কবিতা-বস্তুটির জন্যে চিন্তা ও উৎকণ্ঠা থাকত তাঁর চিঠিতে। কবিতা-আন্দোলনের নানা অধ্যায়ে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তাঁর বাড়িতে, রাস্তায়, আমার অফিসে, ঘরে—সব সময়ই অবলীলায় কাব্যের বস্তু-তত্ত্ব আলাপে ঢুকে গেছে। প্রকাশিতব্য বিষয় সম্পর্কে কে কতোটুকু আন্তরিক, তিনি এ-প্রশ্ন আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করেছেন। বানিয়ে কথা বলার বেনিয়া-যুগে আমি তাঁর প্রশ্নের কী উত্তর দেব? আমি কী করে বা জানতে পারি, সে উত্তর কেমন হবে? অনেক সময়ই তাই চুপ থেকে বলতে হয়েছে: "আপনি সব চাইতে ভালো লিখ্‌ছেন।"

"ভালো?" মৃত্যুর দু'মাস আগেও তিনি চোখ টিপে আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন।

"ভালো নয়? রবীন্দ্রপুরস্কারের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—ইষ্ট পাকিস্তানের বাঙালী কবিরা কেউ বল্‌তে পারবেন, তাঁরা জীবনানন্দের ছাত্র নন? তাছাড়া এখানেও বা কী? জীবনানন্দের বৃত্তে শত-শত তরুণ কবি নেই?"

জীবনানন্দ হো-হো করে হেসে বল্‌লেন: "আপনারা ত বল্‌ছেন কিন্তু আমার স্ত্রী ত এমন কথা বলেন না!"

"আপন মানুষকে অনেকে ভালো বলে প্রচার করতে চান না।" আমি উত্তর দিলাম।

কবিতা উৎকৃষ্ট হচ্ছে কি না এ-সম্পর্কে জীবনানন্দের মনে শেষ পর্য্যন্তও প্রশ্ন জেগে ছিল। 'রেডিও'-র কবি-সভায় তাঁকে শেষ কবিতা-পাঠে দেখেছি। তিনি বিষণ্ণ এবং নিরিবিলি দেখাচ্ছিলেন। তাঁর হয়ত এ ধারনাই বদ্ধমূল হয়েছিল, যে-প্রশংসা তাঁর ভাগ্যে জুটছে সবই তা অন্তঃসারশূন্য। কলকাতা কেন, এখনকার এই পৃথিবীর মতিগতিতে তিনি আন্তরিকতার বাষ্পও যেন আর খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সাজানো কথার ব্যঞ্জনা এবং দল-বাগানো যে-সাহিত্যের বাজারে চলেছে সেখানে জীবনানন্দের মতো আন্তরিকতাবাদীর যে ঠাঁই নেই এ-কথা জানাতে আমার দুঃখ হত; তবু আমি তা আকারে-ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছি। বলায়-ও বিপত্তি হয়েছে। জীবনানন্দের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের অবসান ঘটাবার সুযোগ খুঁজেছেন কেউ-কেউ। দুর্ভাগ্য কবি আমার সুহৃদ নন, এ-কথা আর যে-ই ভেবে সুখী হোক, আমি তা ভেবে দুঃখিত হতে চাইনে।

বাল্যস্মৃতি

অশোকানন্দ দাশ

একজন ইংরেজ কবি তাঁর আত্মজীবনীর ভূমিকায় লিখেছেন "আমরা মহৎ ব্যক্তির জীবনী পাঠ করি এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে তাঁর বিভিন্ন বয়সের বিচিত্র ঘটনা ও কাহিনী, তাঁর কীর্তিকলাপ, অথবা তাঁর জীবনদর্শনের উপর আলোকপাত করে। কিন্তু, যখন দেখি চরিতকার বাল্যজীবনের কাহিনী লিখতে গিয়ে বিস্তারিত ভাবে প্রথম জীবনের কথা—তাঁর নার্স, গভর্ণেস ইত্যাদির কথা বলছেন, যাতে অনেক অসার বস্তু পাঠ করে কথঞ্চিৎ সারবস্তুর দর্শন পাওয়া যায়, তখন আমার ধৈর্যচ্যুতি হয়।" এই স্বল্পপরিসর রচনায় জীবনানন্দ সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে তাঁর বাল্যজীবনের অবতারণা করতে আমি তাই সঙ্কোচ বোধ করছি এই জন্য যে কেউ কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে এ সব কথা তাঁর কাব্যের রসগ্রহণ করবার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। আমার কিন্তু মনে হয় তাঁর বাল্য ও কৈশোরের জীবন, সেই বয়সের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কথা ও যাঁদের সাহায্যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল, তাঁর কাব্যের ক্রমপরিণতি ও জীবনদর্শন বুঝতে সাহায্য করবে। আমরা যখন পুষ্পকোরকের ক্রমপরিণতির কথা জানতে চাই, তখন যে বৃক্ষ হতে তার জন্ম, যে মাটির রসগ্রহণ করে তার বৃদ্ধি, যে বৃন্তে ভর করে সে ঊর্ধ্বমুখী হল, যে আকাশ ও বাতাসের তলে তার বিকাশ, আমাদের পক্ষে এ সমস্তই জানার প্রয়োজন হয়না কি?

দাদা আমার চেয়ে পুরো তিন বছরেরও বড় নন। শৈশবে ও কৈশোরে অনেক সময়েই আমি তাঁর সাথী ছিলাম। আমাদের শৈশব অত্যন্ত আনন্দে কেটেছে। বাবা কমবয়সে ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করার বিরোধী ছিলেন। ছোটবেলায় আমরা মায়ের কাছে লেখাপড়া শিখেছি। সে পাঠ খুব বেশীক্ষণের জন্য নয়। খেলবার, বাগানে বেড়াবার, প্রজাপতির পেছনে দৌড়াবার, ঘুড়ি ওড়াবার, প্রচুর অবকাশ ছিল। স্নেহের শাসন হয়তো ছিল, কিন্তু আমরা কোনোদিন

প্রহার লাভ করিনি। সন্তানশিক্ষায় প্রহারের স্থান নেই, প্রহার করে সন্তানকে শাসন করতে হলে তোমার নিজেরই পরাজয় হল, এরকম একটা ধারণা বাবার ছিল। সন্তানশিক্ষা সম্বন্ধে যে সব পুস্তিকা অথবা প্রবন্ধ তিনি নানা সময়ে লিখেছেন, সর্বত্রই খুব জোরের সঙ্গে এই কথা বলেছেন। সে যুগের ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকেরই Puritanism ছিল কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের একনিষ্ঠ সেবক হয়েও বাবার মধ্যে কোনও Puritanism দেখিনি—বরিশালের দিগন্তবিসারী মাঠের মতই তাঁর হৃদয় উদার ছিল—অনেক হাওয়া ও অনেক আলো সেখানে চলাচল করত। সুতরাং আমাদের বাল্যজীবন বিশেষ কোনও বিধিনিষেধ অথবা অতিরিক্ত অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নিষ্পিষ্ট হয়নি। পড়া, খেলা ও দৈনিক জীবনযাপনের মধ্যে অনেকখানি স্বাধীনতা ছিল।

অতি প্রত্যূষে আমাদের ঘুম ভেঙে যেত। মা গান করতেন—

"মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্ত দ্বারে
তোমার বিশ্বের সভাতে
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে
উদয়গিরি হতে উচ্চে কত মোরে,
তিমির লয় হল দীপ্তি সাগরে,
স্বার্থ হতে জাগো দৈন্য হতে জাগো,
সব জড়তা হতে জাগো রে সতেজ উন্নত শোভাতে।"

বাবা উপনিষদের শ্লোক আওড়াতেন। এঁরা আমাদের "অপরূপ সূর্যচেতনার প্রভাতে নিয়ে আসতেন।"

শীতের প্রভাতে রান্নাঘরের উনুনের পাশে গোল হয়ে বসে—কমলালেবু রঙের আগুনের উত্তাপে উষ্ণ হয়ে, আমরা একান্নবর্তী পরিবারের জ্যেঠতুতো-খুড়তুতো ভাইবোনেরা সদ্য তৈরী হাতে গড়া, আগুনে সেঁকা রুটি গুড়ের সঙ্গে পরমানন্দে খেতাম।

পরিচারকদের সঙ্গে ব্যবহারে পিতামাতার স্নেহ ও সহানুভূতির স্পর্শ থাকতো

বলে তারা সকলেই তাঁদের অনুগত হত। বরিশালের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোক অত্যন্ত স্বাধীনচেতা। কোনও কারণে তাকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা হয়েছে মনে করলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়, তখন সময়ে-সময়ে অত্যন্ত হিংস্র হয়ে ওঠে। বাল্যকালে আমাদের গৃহে এ-রকম বিপত্তি কখনও দেখি নি। পিতামাতা পরিচারক-পরিচারিকাদের পরিবারের লোক বলেই মনে করতেন। বাল্যকালে

এই লেখাটিতে এমন কতোগুলো প্রমাদ থেকে গেছে, যে-গুলো সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে এখনই উল্লেখ করা প্রয়োজন, না-হলে স্থানে-স্থানে ভুল বোঝার কারণ থেকে যাবে। প্রমাদগুলো এমনি :

১৩০ পৃষ্ঠায় ১৫শ পংক্তিতে 'কত'-র স্থানে 'লগো' হবে।
১৩৮ „ ২১শ „ 'হয়েছে।'-র „ 'হয়েছে,' „ ।
১৩৯ „ ১৭শ „ 'fain'-র „ 'gain' „ ।

১৩৯ পৃষ্ঠার তৃতীয় উদ্ধৃতিটিকে "Why the…strain." পর্যন্ত একটি এবং "We are…camp—" পর্যন্ত আরেকটি—এই দু'টি ভাগে বিভক্ত করে দু'টি উদ্ধৃতি বলে ধরতে হবে ; ভ্রমক্রমে এ-দু'টি মিশে গেছে।

১৪০ পৃষ্ঠায় ৪র্থ পংক্তিতে 'loast'-র স্থানে 'feast' হবে।
১৪০ „ ৫ম „ 'fin'-র „ 'fire' „ ।
এবং 'bearth'-র „ 'hearth' „ ।
১৪১ „ ১ম „ 'স্বাবলম্বন'-র „ 'ভাবলক্ষণ' „ ।
১৪৫ „ ১২শ-১৩শ পংক্তির বাক্যটি 'উল্টো কমা'র মধ্যে হবে না।

নিসর্গের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়তো তারই মধ্যবর্তিতায়।

দীনতা ও সরলতার প্রতিমূর্তি ফকির। স্ফটিক জলের মত তার চোখ। তার চোখের দিকে তাকালে তার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখা যেত। অতি নিঃস্ব। ম্যালেরিয়ায় পীড়িত, কিন্তু মুখে সর্বদাই হাসি। দূরের গ্রাম থেকে সে আসত। একখণ্ড জমি ছিল গ্রামে, কিন্তু তার থেকে বিশেষ কিছুই হত না। তখনকার দিনে দরিদ্র কৃষকের একজন আমাদের এই ফকির। আমাদের বাগানে কাজ করত। কাজ আছে বলে তাকে ডাকা হত না, যখনই তার প্রয়োজন হয়েছে বাবা তার জন্য কাজ সৃষ্টি করতেন। অন্য কোনও কাজ নেই হয়তো, বাবা বলতেন, "বর্ষায় ঘাস বড্ড বড় হয়েছে, সাপ লুকিয়ে থাকতে পারে, তুমি এই ঘাস পরিষ্কার কর।" ঘাসের উপর কাস্তে চালালে দাদা কিন্তু কাতর হতেন। এই বিষয়ে অদ্ভুত সমঝদার ছিল ফকির। যে নবীন ঘাস আবার জন্মাবে সেই কচি ঘাস-শিশুদের স্বপ্ন দেখিয়ে প্রবোধ দিত ফকির, "কিছু ভাববেন না খোকাবাবু, কয়েকদিনের মধ্যেই আবার খুব সুন্দর নরম কচি ঘাস হবে।" বাগানে কাজ করতে-করতে ফকির আমাদের অনেক গল্প বলত—শস্যের ফসলের, সেই মাটির যে মাটির কাছে সে অকৃপণ দান কোনও দিন পায় নি। দাদা বলতেন, "ফকির হইয়ে এসেছ জীবনে, যাইবে তুমি ফকির হইয়ে।" দাড়ি নেড়ে, সরস আকর্ণবিস্তৃত হাস্যে ফকির সে-কথা গ্রহণ করত।

প্রহ্লাদ কলসী করে অতি প্রত্যূষে রোজ দুধ নিয়ে আসত। বর্ষার দিনে একহাঁটু কাদা মেখে প্রহ্লাদ দেখা দিত। তার পোক্ত শরীর। কচিৎ কদাচিৎ সে অনুপস্থিত হত। যে প্রপিতামহ একদিন লাঠি হাতে শত্রুকে ধরাশায়ী করত, প্রহ্লাদের সগর্ব পদক্ষেপে বোঝা যেত, সেই প্রপিতামহেরই রক্ত আজো তার ধমনীতে প্রবাহিত। সে সার্থক চাষী। প্রপিতামহ লাঠির প্রতাপে পথিকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ধনরত্ন আহরণ করত। প্রহ্লাদ তার পোক্ত শরীরের মেহনৎ দিয়ে মাটির গর্ভ থেকে ছিনিয়ে নিত শস্যের

গন্তার, সোনার ধান। নবান্নের দিন বড় এক ঘটি করে দুধ-গুড়-নারকোল-মাখা সুস্বাদু চাল আমাদের দিয়ে যেত। মাঝে-মাঝে তার গ্রামে নিয়ে গিয়ে কখনও কচি ধানের চারা, কখনও শস্যের ভারে অবনত শ্যামল ধান্যক্ষেত্র অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে আমাদের দেখাত। দাদা ইংরেজি বা বাংলা কবিতা পড়ছেন, প্রহ্লাদ একহাঁটু কাদা নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাই শুনছে, দেখা যেত। পড়া শেষ হয়ে গেলে সে বলত, "খোকাবাবু, আপনি বড় সুন্দর পড়েন।" সে-সব কবিতা প্রহ্লাদের বুঝবার কথা নয়, কিন্তু বোধ হয় ধ্বনির সৌন্দর্য তার হৃদয়কে স্পর্শ করত।

সন্ধ্যার সময়ে আমরা অনেকদিন ঘুমিয়ে পড়তাম। ঘুমের থেকে জাগিয়ে খেতে নিয়ে যেত মোতির মা, 'পরণ কথা' (রূপকথা) বলবার ঘুষ দিয়ে। রান্না ঘরে কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি পেতে আমরা সবাই বসে খেতাম। পিলসুজের উপর প্রদীপ ম্লান আলো বিতরণ করত। সেই আধো-আলো আধো-অন্ধকারে মোতির মা'র মুখের দিকে চেয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে গল্প শুনতাম। মোতির মা গল্প করবার সময়ে হাত নাড়ত, মুখ নাড়ত, নাসিকা স্ফুরিত হত, বস্তুত সমস্ত অবয়বের সাহায্য নিয়ে সে তার বক্তব্য প্রাঞ্জল করবার চেষ্টা করত। মোতির মা চাষীর মেয়ে। সব সময়েই রূপকথা বলত না, গ্রাম্য জীবনের কাহিনীও অনেক সময়ে তার কাছে শুনেছি। মাছ ধরার গল্প, প্লাবনের গল্প ও ডাইনীর গল্পও শুনেছি বলে মনে হচ্ছে। মোতির মা'র সঙ্গে তার দুই ছেলেকেও আমরা কাউ পেয়েছিলাম—মোতিলাল ও শুকলাল। মোতির মা বলত, মোতিনাল শুকনাল। মাছের দেশের লোক, মাছ না-হলে তাদের খাওয়া হত না। মাছ ধরার কৌশল ওদের কাছ থেকেই আমরা শিখেছিলাম। আমাদের বাড়ীর বাঁশবনের থেকে বেছে-বেছে তলতা বাঁশের ছিপ তৈরী করা হত। মশক-দংশন সহ্য করে, পুকুর বা ডোবার নির্জন কিনারে, ঝোপ-ঝাপের মধ্যে বসে আমরা কখনও-কখনও মোতিলাল অথবা শুকলালের সঙ্গে মাছ ধরেছি। পাড়ায় আমাদের বাড়ীর সকলের স্বার্থরক্ষা করবার জন্য মোতির মা অত্যন্ত

তৎপরতা দেখাত—মোতির মা'র গায়ে অত্যন্ত শক্তি ছিল, কণ্ঠের জোরও প্রবল ছিল, তার সঙ্গে এঁটে ওঠা সহজ ছিল না। দাদা বলতেন, "মোতির মা যদি পুরুষ হত আর একটু লেখাপড়া শিখত, দেশের মধ্যে নামডাক হত ওর।"

বাল্যকালের স্মৃতিতে অবগাহন করে আর একটি চরিত্রের সন্ধান পাচ্ছি। সে হচ্ছে মুনিরুদ্দি। মুনিরুদ্দি রাজমিস্ত্রী। অনেক ইমারত সে তৈরী করেছে, অনেক মন্দির, মসজিদ। সে গুণী। মজুরদের, কামিনদের উপর তার কড়া নজর। ছাদ পেটাতে-পেটাতে তারা শ্রম লাঘব করবার জন্য গান করছে, কিন্তু কোনও গাফিলতি করতে দেবে না মুনিরুদ্দি। কিন্তু রাজমিস্ত্রী—এই তার একমাত্র পরিচয় নয়। মুনিরুদ্দি বড় শিকারী। বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ, ইস্পাতের মত বুক। বুট পরে, কালো কোট গায় দিয়ে, বন্দুক হাতে নিয়ে যখন মুনিরুদ্দি আর তার ভাই লাখুটিয়া কিম্বা কাশীপুরের জঙ্গলের দিকে বীরদর্পে যেতো, তখন তার অন্য মূর্তি। তখন তার কাছে যাই এমন সাহস আমাদের ছিল না। দূরের থেকেই ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধায় তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। যখন সে রাজমিস্ত্রীর কাজ করত, অবসরের সময় যখন মন-মেজাজ ভালো থাকত তার কাছ থেকে নানা রকমের শিকারকাহিনী শোনা যেত। দাদা খুটিয়ে-খুটিয়ে তার কাছ থেকে শিকারের অনেক তথ্য সংগ্রহ করতেন।

শিকারের কিছু-কিছু কাহিনী শুনেছি আমার পিতামহীর নিকট থেকে। কাকা ছিলেন Deputy Conservator of Forests। অনেক শিকার করেছেন তিনি। আমাদের বরিশালের বাড়ীর দেওয়ালে তাঁর শিকার-করা হরিণের শিঙ, বন-মহিষের শিঙ, বাঘের মাথা টাঙানো থাকত। কি রকম সাহস ও তৎপরতার সঙ্গে সে-সব শিকার করেছিলেন, ঠাকুমার মুখে কিছু-কিছু শুনেছি। তবে খুব তথ্যপূর্ণ বর্ণনা তাঁর কাছে শোনা যায় নি। অন্য রকম গল্পও ঠাকুমার কাছে শুনেছি। মা রান্না করতেন, সংসারের অন্য অনেক রকম কাজে ব্যস্ত থাকতেন। ঠাকুমা রাত্রে ঘুমোবার আগে বা রোগশয্যার পাশে বসে অনেক সময়েই আমাদের গল্প শোনাতেন। কীর্তিনাশা নদীর গল্প শুনেছি

তাঁর কাছে। বিক্রমপুরের মেয়ে ছিলেন ঠাকুমা। সেখানকার বৃষ্টির দিনের গল্প, পদ্মানদীর গল্প, আমাদের পূর্বপুরুষদের গল্প মুগ্ধ হয়ে শুনতাম তাঁর কাছে, রোগের কষ্ট ভুলে যেতাম। অন্য কাকারা থাকতেন বিদেশে। আমরা সব সময়েই বরিশালে থাকতাম, তাই আমরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিলাম। বরিশালে বগুড়া রোডে আমাদের ৫।৬ বিঘা জমির উপর বাড়ী ছিল। সেই জমির ঝোপের মধ্যে কোথায় আনারসফলের গায়ে হলুদের ছোপ এসেছে, কাঁঠালগাছে কাঁঠাল কত বড় হ'ল, কত আম হয়েছে নানান গাছে এ-সব তাঁর নখদর্পণে থাকত সব সময়েই, কখনও হিসেবে ভুল হতো না। এক বিষয়ে কিন্তু তাঁর হিসেব অত পাকা ছিল না। গ্রীষ্মকালের দুপুরবেলা ঠাকুমা আচার, আমসত্ব রোদে দিতেন—আমাদের প্রহরী রাখতেন। রক্ষকরা কিন্তু ভক্ষক হতো—আচার, আমসত্ব রোজই কিছুটা কমে যেত। অন্য বিষয়ে অত্যন্ত প্রখর দৃষ্টি থাকলেও, এ-বিষয়ে জেনেও নীরব থাকতেন—তাঁর সমর্থন ও প্রশ্রয় দুই-ই ছিল। আচার, আমসত্বের কথা বলতে গিয়ে দাদার কৈশোর বয়সের একটা কবিতার কথা স্মরণ হচ্ছে। নিচে উদ্ধৃত করছি:

এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
পায়রাগুলো উড়ে যায় কার্ণিশের দিকে এলো মেলো।
এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
ছেলেদের খেলা মাঠে মুহূর্তেই সাঙ্গ হয়ে গেল!
এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
ছিপ ফেলে বাথানের দিকে ঐ চলে যায় জেলে!
এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
জল ধ'রে গেলে মাসী, তারপর কাঁথাগুলো মেলো!
এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
গেল গেল আমসত্ব—পোড়ামুখো বৃষ্টি সব খেল!
এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
হরির মা কতগুলো ডাঁটো আম পেল।
ইত্যাদি।

ক্রমহ্রস্বমান আচার-আমসত্বের কারণ দাদা বাৎলে দিতেন। ঠাকুমার প্রশ্নের জবাবে আমি তাই পুনরাবৃত্তি করে যেতাম। ঠিক স্মরণ নেই, ভক্ষকের তালিকায় বৃষ্টি ও রোদের নামও থাকত বোধ হয়। ঠাকুমা মনে-মনে হাসতেন—আমাদের ছলনা বুঝে ফেলেছেন, এমন কথা কোনও দিন বলেন নি। বড়মামা ছিলেন Bengal Civil Service-এ। নির্ভীক, সত্যাশ্রয়ী। আমরা দু-ভাই তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিলাম। আমরা যখন খুব ছোট ছিলাম—যখন সাঁতার শেখা হয় নি—বড়মামা আমাদের পিঠে নিয়ে দীঘির জলে সাঁতার কাটতেন, ভয় ভাঙ্গাবার জন্য। বড়মামা শিশুদের বন্ধু ছিলেন। তাদের সঙ্গে মিশে, তাদের একজন হ'য়ে গল্প করতে ভালোবাসতেন বড়মামা। নানা বিষয়ের পুস্তকপাঠে অনুরাগ ছিল দাদার ছোটবেলা থেকেই। তাই বড়মামা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাদার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন, গল্প বলতেন। মামাবাড়ীতে যখন যেতাম, রাত্রিতে আঙিনার উপর মাদুর পেতে আকাশের তারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন মামা। এই বিশাল সাম্রাজ্যের সঙ্গে অতি ছোটবয়সেই আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল মামার কল্যাণে। মামা যখন নৌকায় করে মফস্বলে যেতেন, আমরাও কখনও কখনও তাঁর সঙ্গী হতাম। এই উপায়ে বরিশালের গ্রাম্য প্রকৃতি, অনেক নদী-নালা-খালের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

ছোটবেলার থেকেই দাদা নানা বিষয়ের বই পড়তে ভালোবাসতেন। তখনকার দিনে আজকালকার মত ছোটদের পড়বার বই বেশি ছিল না। রামায়ণ ও মহাভারত দাদা অনেকবার পড়েছিলেন। তাঁর মনের খোরাক জোগাবার জন্য বাবা মাঝে-মাঝে একটা Exercise book-এ গল্প ও নানা বিষয়ের সরস রচনা প্রাঞ্জল ভাষায় লিখে রাখতেন। বাবা প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে একবার করে বই-এর দোকানে নিয়ে যেতেন। সে-দিনের জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। আমার চোখে এখনও ভাসছে সন্ধ্যাবেলায় বই-এর দোকানে যাবার সেই স্মৃতি। বাবা আগে-আগে চলছেন নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে, আমরা দু-ভাই পিছনে-পিছনে চলছি, দাদা খুব

উত্তেজনার সঙ্গে কি নূতন বই দেখবেন ও কিনবেন তার জল্পনা-কল্পনা করতে করতে।

ছোটবেলা থেকেই আমাদের রক্তে--বিশেষ করে দাদার—হাঁটার নেশা ছিল। স্মরণ-প্রান্তের প্রায় শেষ সীমানায় গিয়ে মনে হচ্ছে, পঞ্চাশ বছর পূর্বে খুব ছোটবেলায় নেপালে নয়—নেপালের কাছে সুপোলে গিয়েছিলাম। রোজই সকালে ও সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেখানকার জনবিরল উদার প্রান্তরে আমরা হেঁটেছি। মাঠে হাঁটতে-হাঁটতে, আকাশের বুকে মেঘ পাল তুলে সাঁতার কেটে যাচ্ছে দেখে, দাদা বলতেন, "জানিস, বড় হ'য়ে আমি এমন নৌকা তৈরী করব, যাতে করে তুই ঐ মেঘের মতন আকাশে বেড়াতে পারবি।" মনপবনের নৌকার যাঁরা মাঝি, তাঁরা বলতে পারবেন সে-রকম নৌকা তৈরী হয়েছে কি-না। প্রায় ছোটবেলা থেকেই বরিশালের উপকণ্ঠে শ্মশানভূমির পাশ দিয়ে আমরা দু-জনে হেঁটেছি, অবাক হ'য়ে কখনো-বা লাসকাটা ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখেছি। কখনও আরও দূরের পাল্লা, শহর ছাড়িয়ে গ্রামের পথে। বর্ষাকালে নদীর তীরে কত সন্ধ্যায় হেঁটেছি, নদী যখন স্ফীত হয়ে পথকে ছুঁয়ে দিচ্ছে—, অথবা শীতকালে নদীর রেখা যখন বহুদূরে সরে গেছে, নদীর মধ্যে—ধান-ক্ষেতের মধ্যে নেমে গেছি, যে-সব ধান-ক্ষেত রাত্রির নীরব মুহূর্তে অন্ধকারে স্নান করে শীর্ণা নদীর সঙ্গে কথা বলে। নদীর ওপারে দেখেছি সবুজ অন্ধকার। গিরিডিতে উশ্রী নদী পার হয়ে বালুর তটে, আমলকী বনে বহুদিন হেঁটেছি। কখনও হেঁটেছি এপারে ক্রিশ্চান হিলের দিকে। কলকাতার ময়দানে, পার্কে, অলিতে-গলিতে উষাকালে অথবা গভীর রাত্রিতে বহুদিন হেঁটেছি। পুণা শহরে হেঁটে গেছি পার্বতী মন্দিরের চূড়ায়, যারবেদায় পর্ণকুটীরের পাশ দিয়ে, মুলা-মুথা নদীর সঙ্গমে, কার্কীতে, সোনা ডোলার পথে। হেঁটেছি বোম্বাই শহরের পথে-ঘাটে, মালাবার হিলে, ওয়ালীর সমুদ্রের পাশে, ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস থেকে বান্দ্রায়, বান্দ্রা থেকে সাণ্টাক্রুজে, সাণ্টাক্রুজ থেকে জুহুর সমুদ্রতটে। হেঁটেছি দিল্লীর সড়কে-সড়কে যেখানকার ধুলোর সঙ্গে মিশে গেছে অনেক বিলুপ্ত নগরীর

ধুলো ও বালি ; হেঁটেছি শাহানশা বাদশাদের কবরের পাশে-পাশে—মসজিদ ও মিনারের কাছে, লোদী গার্ডেনে, ইয়ুসুফ সরাইতে, মেহরৌলীর পথে। জীবনানন্দ শেষ ঘুমের আগে পর্যন্ত রোজই হেঁটেছেন এক নেশায় আক্রান্ত হয়ে, কোনও সাথীর সঙ্গে অথবা সাথীহীন হয়েও। শুধুই কি হেঁটেছেন শহরের অলিতে-গলিতে, পার্কে-ময়দানে, মনপবনের নৌকা চড়ে অতীত যুগের কত শহর, কত গ্রাম, কত অট্টালিকা, আধুনিক জীবনের কত পটভূমিতে, কত সাগর-সৈকতে, মানুষ-মনের কত অলিতে-গলিতে হানা দিয়ে এসেছেন।

বরিশালে দাদার বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের দিনগুলি বড়ই উজ্জ্বল ছিল। এমন পিতামাতা, এমন পরিবেশ। তখনকার দিনে বরিশালের জীবনে সমাজের বিভিন্ন স্তর ছিল না—ধনী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এমনতর গণ্ডী সৃষ্টি করত না। আমাদের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, কিন্তু পিতা বরিশালের সমাজে সম্মানের উচ্চ আসনে আরূঢ় ছিলেন। মূল্যচেতনা বিশুদ্ধ ছিল। মাতা তাঁর প্রতিভাবান পুত্রের সম্বন্ধে অগাধ আশা পোষণ করতেন। সেই আশা, সেই বিশ্বাস দাদার প্রথম যৌবনে প্রেরণা জুগিয়েছে, তাঁর নিজেরও দৃঢ়বিশ্বাস লাভ করতে সাহায্য করেছে। দাদা ধর্মের অনুষ্ঠান পরবর্তী জীবনে পছন্দ করতেন না, কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্মের সারবস্তুতে বিশ্বাসবান ছিলেন। যে-ধর্মের হাওয়াতে দাদা বড় হয়ে উঠেছিলেন, উপনিষদের সে-ধর্মের নির্দেশ হচ্ছে, অন্ধকার থেকে আলোকে যাবার সাধনা। মানুষের জীবনে পতন আছে, অন্ধকার আছে, কিন্তু তা চিরন্তন নয়, উদ্যম ও সাধনাযোগে পতনকে পশ্চাতে ফেলে ধ্রুব সত্যে, আলোকে পৌঁছতে হবে। বিশ্বচরাচরের সর্বত্র, প্রকৃতির সমস্ত উপকরণে বিশ্ববিধাতার মহিমা ও ঐশ্বর্য প্রতিফলিত হয়েছে। উপনিষদুক্ত এই ধর্মের বাণী হচ্ছে এই। বাল্যে, কৈশোরে অথবা প্রথম যৌবনে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, তাঁর পরিবেশ, এমন-কি তাঁর ধর্ম তাঁকে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল জীবনের ছবি দেখিয়েছে।

তাঁর ছাত্রজীবনের লেখা প্রায় কিছুই নেই, ইংরেজীতে লেখা কয়েকটি সনেট

এবং কবিতা ছাড়া। কীট-দষ্ট সে-সব খাতার থেকে কিছু-কিছু নীচে উদ্ধৃত হ'ল :

"With a devotion deeper than the Saints'
I feel the throbs of morn & eve
As children to mother's bosom cleave
Hushed in blissful sleep, without complaints
I cling to this earth that hourly paints
A new panorama winding up the sleeve—"

অথবা

"Like the robin I would chirrup and outpour
The delight of a crimson dewy draught."

অথবা

"Why with blubbering eyes we painfully look
At the noose of darkness on the crown of life,
Why can't we scathelessly brook
The buffet of the ever-wheeling strife
That life hurls on us—so that we may fain
A deeper wisdom—a profounder strain.
We are built with clay—but there is a lamp
Which burns bright and steady though fed with no oil
Of earthly days & bones of common foil
Which waters cannot quench nor mists can damp
'Tis our birthright—it is the stamp
With which was pressed this mortal coil
The spirit of man which time cannot spoil
Which cannot be spanned or cabinned in a camp—"

অথবা

"He spun moonbeam
He sent sun
He has filled us
With least & fun
And fin of bearth
In His realm
There is no dearth."

ছাত্রজীবনে বলেছিলেন, "Like the Robin I would chirrup and outpour"। কিন্তু যে আশা ও বিশ্বাস নিয়ে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেছিলেন—সে আশা ও বিশ্বাসকে বহুদিন টিকিয়ে রাখতে পারেন নি। নিজের ইচ্ছায়, আদর্শের প্রেরণায় বাবা শিক্ষাব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু, শিক্ষাব্রতী হয়েও, অত্যন্ত অসচ্ছল অবস্থায় থেকেও বাবা তাঁর নিজের কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্মান ও খ্যাতি-লাভ করেছিলেন। কিন্তু উনিশ শতকের মূল্যজ্ঞান ও বিংশ শতাব্দীর মূল্যচেতনায় অনেক প্রভেদ। বেশী ইনকাম-ট্যাক্স না দিলে এই যুগে ও এখনকার সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করা সহজ নয়: যে আনন্দময় পরিবেশ, যে অপেক্ষাকৃত নির্দোষ পৃথিবীর আওতায় জীবনানন্দ বড় হয়ে উঠেছিলেন কোথায় সে অনন্যতুল সমাবেশ? দেখলেন মানুষের মন নির্মল ও নিঃস্বার্থ নয়, মূল্যচেতনা বিশুদ্ধ নয়। অগভীর, একান্ত ভাবে স্বার্থপর, লোভী মানুষের হৃদয়। সব জিনিষকে তাঁর শিক্ষা, তাঁর ধর্ম, তাঁর ঐতিহ্যবাদী মন মহামূল্য দিয়েছে, এ-যুগের লোক শুধু তাকে মহানগরীর ধূলায় নিক্ষেপ করে ক্ষান্ত হয় না, বুটের আঘাতে বিচূর্ণ করে পরমানন্দে নৃত্য করে। নিজের মূল্যচেতনায় দৃঢ় থাকতে গিয়ে তাঁকে তাই অনেক আঘাত সহ্য করতে হয়েছে। যে-সমাজের মূল্যজ্ঞান নেই বলে তিনি মনে করতেন, সেই সমাজকেই তিনি পরে বর্জন করে চলতেন। কেউ যেচে, আগ্রহ করে তাঁর নিজের কাছে এসে আলাপ না-করলে, তিনি কারো সঙ্গেই মিশতে চাইতেন না। যাঁরা রোমান্টিক

কবিদের স্বাবলম্বন সম্বন্ধে অবহিত, তাঁরা হয়তো জানেন যে তদানীন্তন সমাজ ও সমাজ-ব্যবস্থার উপর যখন অনাস্থা ও বিরাগ হয়, তখন অপেক্ষাকৃত অধিক কল্পনা-প্রবণ কবিমানসকে প্রকৃতির সঙ্গে নূতন এক সংশ্লেষে প্রণোদিত করে। সংসারের নিষ্ঠুর ভয়ানক রূপ যখন আকস্মিক পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন সূচিত করে, অথচ বারম্বার সংস্কার অসম্ভব মনে হয়, তখন সংস্কারের প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রাকৃতিক জগতে সান্ত্বনার অন্বেষণ কবির পক্ষে স্বাভাবিক। —"প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতর—সেই কোন্ আদিম জননীর নিকট যেন, নির্জ্জন রৌদ্রে ও গাঢ় নীলিমায় নিস্তব্ধ কোনও অদিতির নিকট।" বিরাট কল্পনা-শক্তির অধিকারী জীবনানন্দ সংসার ও সমাজের উপর অনেকটা বিরূপ হয়ে প্রকৃতির ধ্যানে মগ্ন হলেন—যে-প্রকৃতি শিশুকাল হতে চিরদিনই তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে! এই নিবিষ্ট আত্মসমাহিত কবিকে প্রকৃতি কিন্তু ছলনা করেনি, তাই রসিক কবিতা-পাঠক জীবনানন্দের রচনায় পূর্বে অনাবিষ্কৃত বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের, এক মণিময় দ্বীপের সন্ধান পেয়ে মুগ্ধ হন। তিনি তাঁর ভাবাবেগ প্রকাশ করতে গিয়ে চিত্র এঁকেছেন। এখানে চিত্রই হচ্ছে তাঁর ভাবাবেগের প্রকাশ—poetic equivalent, চিত্রকরের তুলিকা ধারণ করে এই রূপরসগন্ধময় শ্যামলা ধরণীর সমস্ত রূপ ও সমারোহ, প্রকৃতির মনোরাজ্যের সমস্ত রহস্যকে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে অনুভূতির রাজ্যে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। অনুভবগম্য, স্পর্শলভ্য এই চিত্রের মধ্যে কোনও অস্পষ্টতা নেই। Missal-এর (মঠের প্রার্থনাপুস্তকের) উপর অঙ্কিত মূর্তির মত স্পষ্ট ও পরম সুন্দর। বাংলা কবিতায় এ-বস্তু একান্তই অভিনব—জীবনানন্দের পূর্বে কোনও বাঙালী কবি এতখানি বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রকৃতির ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য ও মহিমা আমাদের অনুভূতির রাজ্যে নিয়ে এসেছেন এমন কথা আমার জানা নেই। শব্দ, স্পর্শ, এমন-কি স্বাদ ও গন্ধ পর্যন্ত তাঁর চিত্রমুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এই অপূর্ব কবিতার স্বাদ গ্রহণ করে পাঠকের 'ইমাজিনেশন' তৃপ্তি পায়।

প্রকৃতিবর্ণনায় তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেন নি, কোনও

বস্তুই তাঁর কাব্যে উপেক্ষিত হয় নি, কিন্তু তাঁর বর্ণনায় এমন অভিনবত্ব* আছে যে, অভ্যস্ত বস্তু পাঠে যে মনে জড়তা থাকে, সে-মন নিয়ে তাঁর কাব্যের রসগ্রহণ করা সম্ভব নয়। কল্পনা-অনুরাগী সজাগ মন নিয়ে তাঁর কাব্য পাঠ না করলে সমস্ত সৌন্দর্য উপলব্ধি করা চলে না।

মনে হচ্ছে ২০।২৫ বৎসর আগে সাহিত্যের বিষয়বস্তু কি হবে বা হওয়া উচিত তাই নিয়ে আমাদের দেশে সাহিত্যিক মহলে তুমুল আন্দোলন হয়েছিল। এই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে তখনকার দিনের নবীন সাহিত্যিকেরাও যোগ দিয়েছিলেন। আমাদের মনে শুধু বিষয়বস্তু নিয়ে নয়, সাহিত্যে এবং বিশেষ করে কাব্যে কি শব্দ ব্যবহারযোগ্য, কি শব্দ অচল, এ-সম্বন্ধে একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল। রন্ধনে যা উপাদেয়, সাহিত্যে তা অচল, এমন ধরণের একটা কথা কোনও প্রবীণ সাহিত্যিক উল্লেখ করেছিলেন, মনে হচ্ছে। জীবনানন্দই প্রথম কাব্যে উপেক্ষিত অনেক শব্দকে—অনাদৃত অনেক কথাকে নির্বাসনদণ্ড থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে সেই সব শব্দ ও কথা তাঁর কাব্যে অজস্র ব্যবহার করেছেন। বিষয়বস্তু নির্বাচনে পূর্ববর্তী কবিদের অনুসরণ করেন নি—বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব দেখান নি। কাব্যের বিষয় কি হবে, এর মীমাংসা হয়তো সহজ নয়। কিন্তু ইংরেজ সমালোচকের উক্তি "any subject is possible if you can get away with it"—তার যথার্থতা প্রমাণ করেছেন জীবনানন্দ; যা নিয়েই

*কেউ-কেউ বলেছেন "অদ্ভুত"—ক্ষমা করবেন, তাঁদের এই শব্দ নির্বাচন আমার কাছে একটু অদ্ভুত বলেই মনে হয়েছে। কারণ, "অদ্ভুত" কথাটি "সৃষ্টিছাড়া" অর্থেই বহুলভাবে প্রচলিত। যদিও আধুনিক বাংলায় "অপরূপ" অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকে। যথাযোগ্য ভূমিকার সাহায্যে পাঠকের মন প্রস্তুত না করে নিলে, শব্দের যথার্থ অর্থ বোধগম্য না হতে পারে। সুতরাং সমালোচনার ক্ষেত্রে এ শব্দ ব্যবহার না করাই হয়তো বাঞ্ছনীয়।

লিখেছেন তাকে কুশলতার সঙ্গে কাব্যরূপ দিয়ে। তাঁর হাতে বাংলা কাব্য শুধুই যে শব্দ-সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছে তাই নয়, বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে সীমা-রেখা নির্ধারিত হয়েছিল, সেই গণ্ডীর থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলা কাব্য প্রান্তরের অথবা অবাধ আকাশের উদারতা অথবা বলা যেতে পারে সমুদ্রের বিশালতার অধিকারী হয়েছে। সৎ ও সার্থক কবিতা না হলে অগ্রাহ্য হবে শুধুই এই নিষেধবাণী রইল। উপরে যা বলা হল, আশা করি, পাঠককে তা নিয়ে উদ্ধৃত "কয়েকটি লাইনের" মর্মমূলে পৌঁছে দেবার পক্ষে যথেষ্ট হবে :

"কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী—
আমি ব'হে আনি ;
একদিন শুনেছ যে সুর—
ফুরায়েছে,—পুরানো তা'—কোনো এক নতুন-কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি,—আমার মতন
আর নাই কেউ !

সৃষ্টির সিন্ধুর বুকে আমি এক ঢেউ
আজিকার ;—শেষ মুহূর্তের
আমি এক ;—সকলের পায়ের শব্দের
সুর গেছে অন্ধকারে থেমে ;
তারপর আসিয়াছি নেমে
আমি ;
আমার পায়ের শব্দ শোনো,—
নতুন এ,—আর সব হারানো পুরোনো।"

কোনো-কোনো তথাকথিত সাহিত্যিকের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে বা ছিল যে জীবনানন্দ কেবলমাত্র স্বপ্ন-বিলাসী—সংগ্রামশীল মানব-জীবনের

গতি ও বেগ তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হয়নি, ইতিহাসবেদ থাকলেও সমাজ-বেদ নেই। আমার মনে হয়, জীবনে মাত্র পূর্বজ কবিতা পাঠ এবং অনভিনিবেশ-পাঠের থেকেই এ-ধারণা হয়েছে। এ-কথা অবশ্য সত্য যে, জীবনানন্দ কোনো "প্রাক-নির্দিষ্ট চিন্তা বা মতবাদের দানা" বহন করে কবিতা লিখতেন না; কারণ, তিনি মনে করতেন যে ও-রকম ধারণা নিয়ে বিশুদ্ধ কবিতা লেখা সম্ভব নয়। বিশুদ্ধ কবিতার এই ধারণা ইয়োরোপীয় কবিদের মধ্যেও দেখতে পাই; যাঁরা বলেছেন, "poetry is beauty & beauty is poetry", অথবা Yeats যেমন বলেছেন, "In the poets' church there is an altar but no pulpit." জীবনানন্দের মতে "চিন্তা, ধারণা, মতবাদ, মীমাংসা কবির মনে প্রাক-কল্পিত হয়ে কবিতার কঙ্কালকে যদি দেহ দিতে যায়, কিম্বা সেই দেহকে দিতে চায় যদি আভা তাহলে কবিতা সৃষ্ট হয় না, পদ্য লিখিত হয় মাত্র। চিন্তা ও সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন ও মতবাদ প্রকৃত কবিতার ভিতর সুন্দরীর কাঠামোর পিছনে শিরা-উপশিরা ও রক্তের কণিকার মত লুকিয়ে থাকে।" অন্যত্র বলেছেন, "ইতিহাস-বেদের দরকার এবং সমাজ-বেদের; কিন্তু সব কবিতাই একই ভাবে অথবা কোনও কবিতাই উত্তমর্ণ হিসেবে নয়; কবিতার চেয়ে তার উপকরণ বড় হবে না। এই সব বেদের একান্ত মর্মজ্ঞানের ভিতর থেকে যে-কবিতাগুলো ক্রমে-ক্রমে তারপর উৎসারিত হয়ে এসেছে, আমার মনে হয়, সে-সব কবিতায় বেদ যথাস্থানে আছে,—কবিতাগুলোকে গ্রাস করতে পারেনি।" যাঁরা অভিনিবেশ সহকারে "সাতটি তারার তিমির"-এর কবিতাগুলো পড়েছেন, অথবা আরো শেষের দিকের কবিতা, তাঁরা জানেন, "বেদ" যথাস্থানেই আছে, সে-সব "সুন্দরীর" রক্ত-স্পন্দনের মধ্যে সৎ পাঠক নিশ্চয়ই তা অনুভব করেছেন। উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যেতে পারে "সাতটি তারার তিমির"-এর কবিতাগুলি। এর অনেক কবিতা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা, সভ্যতার সংকটের দিনে লেখা কবিতা। কৃষ্টি শেষ হয়ে যাচ্ছে, পৃথিবী ধ্বসে যাচ্ছে যখন। যখন

"চোখের উপরে
রাত্রি ঝরে ;
যে দিকে তাকাই
কিছু নাই
রাত্রি ছাড়া ;"

যখন প্রতারণা, মিথ্যাকথন, লোভ রয়েছে সমস্ত কলকাতা শহরে। সর্বত্রই। "চেৎলার হাট থেকে টালার জলের কল" পর্যন্ত যখন "জাঁহাবাজ"। "ভিখিরীকে একটি পয়সা দিতে ভাসুর ভাদ্র বৌ সকলে নারাজ।" যখন "নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয় লিবিয়ার জঙ্গলের মত।" যখন

"বহু উপদেশ দিয়ে চ'লে গেলে কনফুশিয়াস—
লবেজান হাওয়া এসে গাঁথুনির ইঁট সব ক'রে ফেলে ফাঁস।"

যখন,—"কামাতুর লোকেরা নিপট কপট হয়ে বলে "এ রকম রিপু চরিতার্থ ক'রে বেঁচে থাকা মিছে।" "

কিন্তু এই লোভ হিংসা রিরংসার দিনে, কৃষ্টির অবসানের দিনেও আমরা "সাতটি তারার তিমিরে" আশ্চর্য প্রতীতির কথা শুনতে পাই। তখনও মনে হয়েছে,

"সর্ব্বদাই কোনো এক সমুদ্রের দিকে
সাগরের প্রয়াণে চ'লেছি।"

জিজ্ঞেস করেছেন,

"জীবনের শুভ অর্থ ভালো ক'রে জীবনধারণ
অনুভব ক'রে তবু তাহাদের কেউ কেউ আজ রাতে যদি
অই জীবনের সব নিঃশেষ সীমা
সমুজ্জ্বল, স্বাভাবিক হয়ে যাবে মনে ভেবে—

স্মরণীয় অঙ্কে কথা বলে,
তাহ'লে সে কবিতা কালিমা
মনে হবে আজ?"

বলেছেন,

"আজকে সমাজ
সকলের কাছ থেকে চেয়েছে কি নিরন্তর
তিমির বিদারী অনুসূর্য্যের কাজ।"

অথবা

"—তবু
মধ্যবিত্তমদির জগতে
আমরা বেদনাহীন,—অন্তহীন বেদনার পথে।"

যুদ্ধকালীন মানুষকে লোভের পর্বতে উঠতে দেখে, রিরংসার গহ্বরে নামতে দেখে প্রশ্ন করেছেন,

"তিমিরহননে তবু অগ্রসর হয়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী?"

নিজেই উত্তর দিয়েছেন,

"আমরা তো তিমিরবিনাশী
হতে চাই।"

আরও প্রত্যয়ের দৃঢ় ভুমিতে দাঁড়িয়ে বলেছেন,

"আমরা তো তিমির-বিনাশী।"

আবার

"মনে হয় সুচেতনা, তোমার হৃদয়ে
ভুল এসে সত্যকে অনুভব করে।"

অথবা

"তবুও ভোরের বেলা বার বার ইতিহাসে সঞ্চারিত হয়ে
দেখেছে সময়, মৃত্যু, নরকের থেকে পাপীতাপীদের গালাগালি
সরায়ে মহান সিংহ আসে যায় অনুভাবনায় স্নিগ্ধ হয়ে,—"

অথবা

"তবুও নক্ষত্র নদী সূর্য্য নারী সোণার ফসল মিথ্যা নয়।
মানুষের কাছ থেকে মানবের হৃদয়ের বিবর্ণতা ভয়
শেষ হবে ;"

অথবা

"কোথাও পাখির শব্দ শুনি ;
কোনো দিকে সমুদ্রের সুর ;
কোথাও ভোরের বেলা রয়ে গেছে তবে।"

"বিলীন হয় না মায়ামৃগ—নিত্য দিকদর্শিন ;
অনুভব ক'রে নিয়ে মানুষের ক্লান্ত ইতিহাস
যা জেনেছে—যা শেখে নি—
সেই মহাশ্মশানের গর্ভাঙ্কে ধূপের মত জ্ব'লে
জাগে না কি হে জীবন—হে সাগর—"

জ্ঞানান্বেষী মন, অনেক কিছু জেনেও, শান্তিতে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না এই বিশ্বাসে, যে সব জানা শেষ হয়ে গেছে। তার কাছে কোনও স্থিরভূমি নেই। তার কানে বারংবার ধ্বনিত হচ্ছে, "আরো আছে, আছে।" নব-

অভিযানের প্রয়োজন আছে। এই শুনুন,

"মানুষেরা বার বার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে ;
নব নব ইতিহাস-সৈকতে ভিড়েছে ;
তবুও কোথায় সেই অনির্ব্বচনীয়
স্বপনের সফলতা—"

"যতই শান্তিতে স্থির হয়ে যেতে চাই ;" আঘাত পাই, কারণ,

"কোথাও আঘাত ছাড়া—তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্য্যালোক নেই।"

সুতরাং

"হে কালপুরুষ তারা, অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে উঠে যেতে হবে
কেবলি গতির গুণগান গেয়ে—সৈকত ছেড়েছি এই স্বচ্ছন্দ উৎসবে ;"

সেই সব অভিযান "নব নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ" জয় করবে।

"জয় ক'রে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হয়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন
হবে না কি মানবকে চিনে—"

আর

"সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চ'লেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয় ;—
জয়, অস্তসূর্য্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।"

অথবা

"হে সাগর সময়ের,
হে মানুষ,—সময়ের সাগরের নিরঞ্জন-ফাঁকি
চিনে নিয়ে বিমলিন নাবিকের মতন একাকী

হ'লেও সে হত, তবু পৃথিবীর বড় রৌদ্রে—
আরো প্রিয়তর জনতায়
'নেই' এই অনুভব জয় ক'রে আনন্দে ছড়ায়ে যেতে চায়।"

"সাতটি তারার তিমির"-এর শেষ কবিতা—'সূর্য্যপ্রতিম'। আলোকের উন্মেষের প্রতিশ্রুতি—নব পৃথিবীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে এই কবিতায়। পৃথিবী অন্ধকার, সূর্য্যের উজ্জ্বল দীপ্তি আজ নেই, চাঁদের স্নিগ্ধ আলোকও নেই, শুধু তারার ক্ষীণ জ্যোতি। পথ অন্ধকারে ডুবে আছে। আমরা কি চাঁদ উঠ্‌বার জন্য অপেক্ষা করব? নব পৃথিবী আবিষ্কার বিলম্বিত হবে?

"আমরা অপেক্ষাতুর;"

কিন্তু, তথাপি,

"চাঁদের ওঠার আগে কালো সাগরের
মাইলের পরে আরো অন্ধকার ডাইনী মাইলের
পাড়ি দেওয়া পাখিদের মত
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় জোগান দিয়ে ভেসে
এ অনন্ত প্রতিপদে তবু
চাঁদ ভুলে উড়ে যাওয়া চাই,
উড়ে যেতে চাই।"

"এসো আমরা যে যার কাছে—যে যার যুগের কাছে সব
সত্য হয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠি।
নব পৃথিবীকে পেতে সময় চ'লেছে?"

কেবল ইতিহাস-বেদ ও জীবন-বেদই নয়, এমন-কি বাস্তব জীবনের কোনো দৃশ্য যদি হৃদয় আলো করে আসে, তবে সেই বাস্তব জীবনদর্শনের যথার্থ প্রতিকৃতি, জীবনানন্দের মতে, বিশুদ্ধ কবিতায় আত্মপ্রকাশ করতে পারে। "সাতটি তারার

তিমির”-এর ‘লঘু মুহূর্ত্ত’ কবিতাটি এর উদাহরণ-স্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে। জীবনানন্দের ভাণ্ডারে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত এ-রকম আরো অনেক কবিতা আছে।

কেউ-কেউ তাঁর মধ্য-পর্যায়ের কবিতার সম্বন্ধে জটিলতার অথবা অস্পষ্টতার অভিযোগ করেন। যিনি মহৎ কবি, তাঁর অভিজ্ঞতার অভিযানে তিনি আমাদের থেকে কিছুদুর অগ্রসর হয়ে থাকেন। এই অভিজ্ঞতার ব্যবধান সৎ পাঠক সজাগ মনে ও অভিনিবেশ দ্বারা যতদিন না দুর করতে পারেন, অথবা কবি আমাদের সীমিত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যতদিন না পুনঃপ্রবেশ করেন তাঁর কাব্য আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয় না। এ-কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যদিও একদা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেও বহু বিখ্যাত অধ্যাপক ও মাসিক পত্রের প্রবীণ সম্পাদক-গোষ্ঠী এ-রকম অস্পষ্টতার অভিযোগ তুলেছিলেন, এখন কালগত ব্যবধান যখন অতিক্রান্ত হয়েছে, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীও হয়তো সে-রকম অভিযোগ শুনলে দন্ত বিকশিত করবেন। জীবনানন্দ তাঁর “কবিতা পাঠ” প্রবন্ধে বলেছেন, “ভাল কবিতা পড়ে আমার অভিজ্ঞতার কোনও একটি উপেক্ষিত (খুব সম্ভব বিশৃঙ্খল) অংশে সম্বিত এল— গোছানো হতে লাগল সব — কবি যা দেখতে চাচ্ছে, আমি ভিন্ন ব্যক্তি বলে সবটা সম্পূর্ণ ভাবে দেখতে পাব না। কিন্তু, আমার মনশ্চক্ষে অনেকখানি দেখলাম—আমার অভিজ্ঞতার একটা অংশ সঙ্গতি সাধনের স্বস্তি লাভ করল, সার্থক সব কবিতার ভিতর দিয়ে যে সঙ্গতি সম্ভব হয়; আনন্দ পেলাম। আমাদের কথাবার্ত্তা ও যুক্তিতর্কের চেয়ে এ-স্বাদ অন্য রকমের; জীবনের যে-কোনও মুহূর্ত্তে যুক্তি-তর্ক চালাতে পারি; কথা বলতে পারি; কিন্তু আরো কিছু সুস্থির ও তদ্গত না হলে শাদামাটা কবিতা পড়েও স্বাদ গ্রহণ করা কঠিন। কবিতা আরো সৎ হলে পাঠকের কাছ থেকে সুস্থিরতা ও নিবেশের দাবী করবে না, শুধু পাঠকের অভিজ্ঞতা ও তার মূল্য সম্বন্ধে চেতনা কি রকম বুঝে দেখবে। এত সব দাবী এদের তৃপ্তি সাধন (ভাল পাঠকের বেলায়ও) সব মুহূর্ত্তেই ঠিক ভাবে সংস্থিত হয় না।”

তাঁর প্রথম পর্যায়ের চিত্ররূপময় কবিতা বহু সংখ্যক পাঠককেই মুগ্ধ করেছিল, কিন্তু, পাঠকের মুখের দিকে চেয়ে তাঁদের ভক্তি অথবা সমর্থনের লোভে তিনি শুধু সে-সব ধ্যান অথবা ভাবনা নিয়ে রোমন্থন করেন নি। তাঁর কল্পনান্বেষী মন নব নব অভিযানে ব্যাপৃত হয়েছে। তাঁর কাব্য-জীবনে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান ছিল। অনেক প্রকার অভিযান ছিল। সে-সবই হয়তো সফলতা লাভ করে নি। কিন্তু এই রকম একজন কবি যাঁর কবিতা ক্রমপরিণতি লাভ করেছে তাঁর পক্ষে কিছু-কিছু অসফল অভিযানও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সর্ব দেশের মহৎ কবিদের সম্বন্ধেই এ-কথা বক্তব্য।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে, ব্যক্তি-জীবনানন্দের সম্বন্ধে দু-একটী কথা বলে শেষ করছি। তিনি ব্যঙ্গে সুনিপুণ ছিলেন। কিন্তু হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল; ব্যঙ্গের দংশনে কেউ ব্যথা পাবেন, কিছুমাত্র সন্দেহ থাকলেও, শর নিক্ষেপ করতেন না। আমাকে ও মাকে বিশেষ করে শরবিদ্ধ করতেন, কারণ আমরা বুক পেতে গ্রহণ করতে পারব, অন্তর্নিহিত রস বোঝা শক্ত হবে না আমাদের পক্ষে, এমন বিশ্বাস তাঁর ছিল। আপনারা সকলেই জানেন একদল তথাকথিত সমালোচক হিংসায় উদ্দীপ্ত হয়ে নেকড়ে বাঘের মত তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। সেই সব সমালোচক যাঁরা সৎ ও শুভ বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে লেখেন না, বরং যাঁদের বলা যেতে পারে সাহিত্যিক-ভাঁড়—যাঁদের আবেদন হচ্ছে সস্তা রসিকতা নিবেদন, যাঁদের সম্বন্ধে বলা যেতে পারে,

> "বাঙ্গলাভাষার গণ্ডোপরি বিরাজ কর বিস্ফোটক
> বাঙ্গলাভাষার কেউ তুমি নয় হংস, সারস কিম্বা বক!"—

তাঁরা বহুদিন ধরে তাঁর কাব্যের ও ভাষার তীব্র ও নিষ্ঠুর সমালোচনা করেছেন—নেকড়ে বাঘের দাঁতের হিংস্রতা নিয়ে। এ-সব সমালোচকের বিরুদ্ধে Byron'র মত ব্যঙ্গ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না; কিন্তু হয়তো তিনি মনে করেছিলেন, ব্যঙ্গ করে সমালোচককে আহত করা

সম্ভব কিন্তু অরসিককে রসবোদ্ধা করা সম্ভব নয়। সুতরাং উদ্দেশ্যহীন আঘাত-দানের কোনও তাৎপর্য তিনি দেখতে পান নি। কোমল-হৃদয় জীবনানন্দ তাই তাঁর স্বভাবসুলভ উদারতার সঙ্গে নীরব থাকতেন। তিনি তেমন কোনও কবিতা লেখেন নি যা শুধুই বিদ্রূপাত্মক, কিন্তু "সমারূঢ়", "কবিকে দেখে এলাম" এ-সব কবিতার মধ্যে এবং অনেক কবিতার অনেক লাইনে পাঠক তাঁর বিদ্রূপের শক্তির পরিচয় পাবেন। কিন্তু এ-সব বিদ্রূপ কোন সময়েই হিংসাত্মক হয়ে ওঠে নি। তাঁর হৃদয়কে পরশ্রীকাতরতা কখনও স্পর্শ করে নি। তাই দলাদলি, ঈর্ষা বা গোষ্ঠীবদ্ধতা হতেও বহুদূরে থাকতে ভালোবাসতেন।

তিনি নির্জনতা-প্রিয়, লোকের সঙ্গে মিশতে চান না, এ-রকম একটা কথা মুখে-মুখে প্রচারিত হয়েছিল। সন্দেহ নেই, তিনি লাজুক স্বভাবের ছিলেন। কিন্তু এ-কথা সত্য নয় যে, তিনি সব সময়ে নির্জনতা-প্রিয় ছিলেন। বহু লোকের কাছ থেকে বহু আঘাত পেয়েছিলেন, অনেক জ্ঞানপাপী তাঁকে যথার্থ মূল্য দিতে নারাজ, এমন একটা ধারণাও বোধ হয় তাঁর ছিল। সুতরাং অভিপ্রায় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত সকলেই তাঁর কাছে 'Suspect' হয়ে থাকত। কিন্তু তাঁর হৃদয়ের জমাট বরফ যদি কেউ একবার ভেঙ্গে দিতে পারত, সেই সুভাজনের সমাগমে তিনি আনন্দই পেতেন। সরল শিশুর মতন নিমেষেই তাকে আত্মীয় করে নিতে পারতেন। বরিশালে নির্জন পরিবেশ ছিল—প্রকৃতির অবর্ণনীয় সৌন্দর্য ছিল। কিন্তু কর্মের প্রেরণায় সেই নির্জনতা আঁকড়ে থাকতে চান নি, বুদ্ধদেববাবুকে লিখিত নিম্নে উদ্ধৃত অংশটি পড়লেই বোঝা যাবে,

> "কলকাতার অলিগলি মানুষের শ্বাস রোধ করে বটে, কিন্তু কলকাতার ব্যবহারিক জীবনে একটা প্রান্তরের মত মুক্তি পাওয়া যায়; এখন যখন জীবনে কর্ম্মবহুলতার ঢের প্রয়োজন, কলকাতার এই স্বচ্ছন্দ পটভূমির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা চলে না আর।"

মাতা ও মাতামহের মত তিনি অত্যন্ত হাস্যরসিক ছিলেন। গ্রীষ্মের ছুটীতে তিনি যখন কলকাতা থেকে বাড়ীতে আসতেন, গ্রীষ্মের অনেক মন্থর প্রহর হাসিঠাট্টায় উজ্জ্বল হত, এ-কথা এখনও স্মরণ আছে। সে-সব বৈঠকে মাতাপিতাও যোগ দিতেন। কলকাতার পার্কে, মাঠে, যেখানেই humour'র গন্ধ পেতেন দাঁড়িয়ে যেতেন। অদ্ভুত, অস্বাভাবিক সব কিছুই তাঁর রসিকতা-জ্ঞানকে সুড়সুড়ি দিত। অকুস্থান থেকে একটু দূরে গিয়ে হাওয়ার মত হাসির ঝড় বইয়ে দিতেন। একদিনকার ঘটনা বলছি। তখন কলেজে পড়্ছি, Oxford mission হস্টেলে থাকি, দাদা বাইরের থেকে প্রায় দৌড়ে আমার ঘরে এসে একজন ধনী নামজাদা গম্ভীর প্রকৃতি অধ্যাপকের নাম করে বললেন যে, শীগগির দেখে যা, তিনি আমাদের হস্টেলের সামনে দিয়ে সাইকেলে চড়ে যাচ্ছেন। সেই অধ্যাপক সাইকেলে চড়ে যাবেন, তা এতই অবিশ্বাস্য যে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখবার জন্য বাইরে এসে দেখি যে মলিন সার্ট গায় দিয়ে একজন ভদ্রলোক সত্যিসত্যিই যাচ্ছেন; উপরি-উক্ত অধ্যাপকের সঙ্গে যাঁর অবয়বের অনেক সাদৃশ্য আছে। আমাদের একজন আত্মীয় খুব হাত-পা নেড়ে, দাড়ি নাড়িয়ে কথা বলতেন, জীবনানন্দ অনেক সময় মিনিটের পর মিনিট অবাক হয়ে, চোখের কোণে হাসি নিয়ে, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন—কোনও কথা তাঁর কানে প্রবেশ করত না। খুব রোগা-লম্বা লোক, সরলরেখার সংজ্ঞাকে যিনি প্রায় সপ্রমাণ করছেন; অথবা কোনও শ্রীমতী, যাঁর আয়তন অত্যন্ত বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়েছে; অথবা সে-সব লোক, যাঁদের অবয়বে কোনও বিসদৃশতা আছে;—পথে দেখলে দাঁড়িয়ে যেতেন। কোনও সময়ে বলতেন, "হলিউডের কি দুর্ভাগ্য, এঁদের দেখা এখনও পায় নি। এঁদের লিখিয়ে-পড়িয়ে নিলে কি উজ্জ্বল সব চিত্র পরিবেষণ করতে পারত। কোথায় লাগে তোমার Laurel আর Hardy!" ১৯৫৩ সালে পূজোর সময় আমার দিল্লীর গৃহে অনেক আত্মীয় ও বন্ধুর সমাগম হয়েছিল। সকালবেলা আমাদের ঘরের পাশের bath-room হয়তো আটকা, দাদাকে জিজ্ঞেস করেছি আমার ঘর থেকেই, "তোমার bath-room খালি আছে কি?"

দাদা তক্ষুনি জবাব দিয়েছেন, "দিল্লীর মসনদ কি কখনও খালি থাকে ?"

প্রবন্ধ সমাপ্ত করবার পূর্বে তাঁর শেষ কয়েক বৎসরের কবিতার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। মধ্য-পর্যায়ের কবিতার সম্বন্ধে যে যেই মতই পোষণ করুন না কেন, পাঠক তাঁর নিজ-নিজ রুচি ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে থেকে ;—তাঁর শেষ কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতাগুলির প্রকাশে কোনও অস্বচ্ছতা ছিল না, এ-কথা প্রায়ই সর্ববাদীসম্মত। মহৎ কবি অনেক সময় নিজের সঙ্গেই দ্বন্দ্বে জড়িত থাকেন—প্রতীতির সঙ্গে অনিশ্চয়তার। তাঁর মধ্য-পর্যায়ের কোনও-কোনও কবিতার উপর এই দ্বন্দ্বের ছাপ পড়েছে, কারণ তিনি হয়তো জার্মান কবি Hermann Hesse'র মতন বিশ্বাস করতেন, "it would serve atonce as a warning and an inspiration to his fellow-men"। এই রক্তক্ষরণকারী হৃদয়-দ্বন্দ্বের পর নিজের বিশ্বাসে আরও দৃঢ় হয়ে অনেকটা শান্তি তিনি পেয়েছিলেন শেষের কয়েক বৎসর। অবিশ্যি এ-কথা স্বীকার করতে হবে যে এ-যুগের মানুষের হৃদয় নির্মল ও নিঃস্বার্থ হয় নি, হৃদয়ে স্বার্থ ও রিরংসার অবলেশও কেটে যায় নি, কৃত্রিম জীবনযাপনের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে সরল ও অনাড়ম্বর জীবনের আদর্শও মেনে নেয় নি। বহুলোকের হৃদয়ে অন্ধকার থাকলেও অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে অন্তত অমৃতসূর্য দর্শন করবার তাগিদ আছে। এ-কথা অনুভব করেছেন : একদল নবীন যুবকের হৃদয়নিঃসৃত অকপট ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রেমের নিদর্শন পেয়ে, নূতন করে বাঁচবার সাধ হয়েছে। এ যেন গ্রামের মেয়ের অন্ধকার রাত্রিতে প্রদীপকে আঁচলের আড়াল করে পথে চলার বাসনা। সংগ্রামের অন্তে হৃদয়ে শান্তির আবির্ভাব হয়েছিল। সুবাতাসে তরণী আবার চলমান হয়েছিল। বাল্যকালে, কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে যে আনন্দ পরিবেশে বিচরণ করেছিলেন, সেই নির্মল আনন্দের দেশের দিকে তরণী চালিত করেছিলেন ; নবজীবনের নূতন জীবনবেদের সুরু হয়েছিল। অনেক পথ অতিক্রম করা বাকী ছিল, কিন্তু অস্পষ্ট ভাবে স্বদেশের তটভূমি দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। জীবনের আশা, বিশ্বাস ও

যুক্তিকে কোনও নূতন ও সফল সঙ্গতি দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। নির্ভরতার দৃঢ় ভূমিতে দাঁড়িয়ে, তাঁর শেষ-জাতক কবিতাগুলি তারই লক্ষণে সমৃদ্ধ। আজকের অনেক দিকনিরূপকদের সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে বলে গেছেন,

"যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা ;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।"

আর

"যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের চোখে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শান্তি অথবা সাধনা"

আজকের পৃথিবী তাদের মন্ত্র গ্রহণ করছে না,

"শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।"

অনেক কবির সম্বন্ধে এ-কথা বলা চলে যে, তিনি যদি আরো বেঁচে থাকতেন, নূতন কিছু হয়তো দান করতেন না, যা পূর্বে দিয়েছেন, তারই পুনরাবৃত্তি হত। কিন্তু জীবনানন্দ সম্বন্ধে এ-রকম কথা বলা চলে না। তাঁর কাব্য-জীবনকে নদীর বিশালতার সঙ্গে—নদীর বেগ ও গতির সঙ্গে—তুলনা করা যেতে পারে—গঙ্গা কিম্বা ব্রহ্মপুত্র কিম্বা অ্যামেজনের সঙ্গে—যে-নদীতে আপনি যদি তরণী বেয়ে চলেন, দু' পাশে দেখতে পাবেন নব নব চিত্র, দেখবেন সোনার ক্ষেত; পাবেন সাগরসঙ্গমে চলে যাবার তাগিদ।

একদা প্রশ্ন ছিল,

"যেই দিন তুমি যাবে চলে
পৃথিবী গাবে কি গান তোমার বইয়ের পাতা খুলে ?"

আজকের কবি বলছেন,

"নেই সেই নাগরিক আর।
নগর-আত্মার কাছে নিবেদিত হ'য়ে
রেখে গেছে তবু এক সবুজ প্রত্যয়,
আভা যার কিছু কিছু
ছড়াবেই বহুদূর সমুদ্র-সময়।"

ছড়াবে ; কারণ, জীবনানন্দ নিজেই লিখেছেন,

"সময়ের হাত
সৌন্দর্য্যেরে করে না আঘাত
মানুষের মনে
যে সৌন্দর্য্য জন্ম লয়—শুকনো পাতার মত ঝরে নাক' বনে
ঝরে নাক' বনে।"

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ
শ্রীমতী বাণী রায়

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ যে দ্বীপে ক্ষণ-বিশ্রাম লাভ করে, সে দ্বীপে অবশ্যই তার পায়ের চিহ্ন পড়ে থাকে না।

যে পথ ক্ষণ-জন্মারও প্রতিটি পায়ের ছাপ ধরে রাখতে পারে না, আমি সেই পথ। আমার জীবনে অনেক দুর্লভ প্রতিভার নিকটস্থ হ'বার সৌভাগ্য হয়েছে, কিন্তু সহজ-প্রাপ্তির আনন্দে মূল্যবানকেও যথোচিত মূল্য দিতে পারি নি হয়তো। আজ মনে অনুতাপ আসে; জীবনানন্দ দাশের সঙ্গ যখন পেয়েছিলাম, কেন আরও নিবিড়তার সন্ধান করি নি; কেনই বা প্রত্যেকটি সাক্ষাতের খুঁটিনাটি সম্পর্কে একান্তচিত্ত হই নি?

অনাত্মীয়া-মহিলা হিসাবে হয়তো কম নারীই এই লজ্জাশীল ও সমাজবিমুখ কবির নিকটস্থ হ'বার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে মিশেছিলাম পুরুষের মত করেই। তাই, কবি হয়তো আমার কাছে কদাচিৎ সহজ অন্তরঙ্গতায় ধরা দিতেন। নারী সম্পর্কে তাঁর সহজাত সম্ভ্রমবোধের সঙ্গে সুদূর সঙ্কোচ ছিল। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের দিনগুলি সংখ্যায় অধিক ছিল না, কিন্তু গভীরতায় গাঢ় ও স্থায়িত্বে দীর্ঘ ছিল। সেই অমূল্য দিনগুলির স্মৃতি শোকতন্ময় মনে একমাত্র সান্ত্বনা। আমি তাঁর জীবনের কোন ঘটনা বা incidents সম্পর্কে অবহিত হ'বার চেষ্টা করি নি, কেবল মানুষ হিসাবে তাঁকে চিনবার চেষ্টা করেছিলাম।

স্বর্গগত জীবনানন্দ দাশ আমার বন্ধু (Institute of Education for women কলেজের অধ্যক্ষা) নলিনী দাশের ভাশুর হতেন। নিনি বিবাহের পর তাদের রসা রোডস্থ বাসা মোহিনী ম্যান্‌সনে আমাকে ডেকেছিল। সেখানে জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ (১৯৪৩-৪৪ সাল আনুমানিক)।

নিনি জীবনানন্দের কনিষ্ঠ অশোকানন্দকে বিবাহ করেছে জেনে 'আমি উল্লসিত ছিলাম। সমাজবিমুখ, লজ্জাশীল, প্রখ্যাত কবি কিন্তু নিজেই আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত আমার 'লুক্রেশিয়া' গল্প পড়বার পরে। প্রথম সাক্ষাতের সঙ্গে-সঙ্গে তিনি আমার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনি বাণী রায় ?"

একটু সন্দেহাকুল মনে হ'ল ওঁকে,—"হ্যাঁ" উত্তরের পর তেমনি ভাবেই প্রশ্ন করলেন, 'লুক্রেশিয়া' আপনার লেখা ?"

তিনি যেন যাচাই করে সত্যাসত্য জেনে নিতে চান। তখন আমি নবীনা লেখিকা মাত্র, কবিকে দেখে আমারই সঙ্কোচ হ'বার কথা। প্রথম আলাপ কিন্তু অত্যন্ত সহজ অন্তরঙ্গতার মধ্যেই সম্পাদিত হয়েছিল।

এই পরিচয়ের প্রকৃত রূপটির মধ্যে জীবনানন্দের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয়। তিনি নূতন লেখকদের রচনা পাঠ করতেন, তাদের উৎসাহ দিতেন। তাঁর নিয়মিত পড়াশোনার অভ্যাস ছিল। সাহিত্যকে তিনি ভালবাসতেন অতি আন্তরিক ভাবে। 'শনিবারের চিঠি'র প্রত্যেক সংখ্যায় প্রায় তাঁকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা সত্ত্বেও সেই পত্রিকা তিনি পাঠ করতেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত গুণগ্রাহী।

তারপর, ল্যান্সডাউন রোডের দ্বিতলে আবার তাঁর সঙ্গে পূর্ব আলাপের সূত্র টানা হয়। শেষ পর্যন্ত সেই ঠিকানা ছিল তাঁর। জীবনানন্দ তখনও বরিশাল কলেজে অধ্যাপনা ছাড়েন নি। ছুটীতে যাতায়াত চলছে ও ছেড়ে দেবার উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে। কবির মা তখন জীবিতা ছিলেন। তাঁর অতীত কবি-খ্যাতি শুনেছিলাম। কবির পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু ছিলাম না। তবে জানি মাতাকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। ছোটভাই অশোকানন্দের প্রতি তাঁর প্রচুর স্নেহ ছিল। তাঁর পুত্র, কন্যা ও সহধর্মিনীকে বন্ধুমহলে টেনে আনার বিপক্ষে ছিল তাঁর আত্মগোপনধর্মী সত্তা। সাংসারিক তরীর হাল ধরা ছিল কবিপত্নীর হাতে। নিজের ঘরে অনেক বই নিয়ে সম্পূর্ণ সাহিত্য পরিবেশে নিঃসঙ্গ হয়ে থাকতে জীবনানন্দ ভালবাসতেন। আর ভালবাসতেন মনের মত বন্ধুদের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা।

প্রত্যেকদিন বিকেল থেকে সন্ধ্যার পর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে লেকের ধার পর্যন্ত ভ্রমণ তাঁর অভ্যাস ছিল। এই অভ্যাস তিনি কখনও ছাড়েন নি। বিকেলের পর তাঁকে বাড়ী পাওয়া শক্ত ছিল। ১৪ই অক্টোবর লেকের পাড় থেকে ভ্রমণ সেরে ফেরার পথেই তিনি ট্রামের ধাক্কায় আহত হয়েছিলেন।

প্রকৃতির প্রতি জীবনানন্দের প্রবল আসক্তি ছিল, তাঁর কবিতার পংক্তির আড়ালে সেই প্রকৃতিকে ধরা যায়। হয়তো সেই প্রকৃতির আকর্ষণ নিত্য তাঁকে লেকের ধারে নিয়ে যেত। একলা যেতেন। বরিশালে তিনি বি. এ. পর্যন্ত পাঠ করে-ছিলেন। তখন মাঠে ঘাটে যথেচ্ছা ভ্রমণ তাঁর অভ্যাস ছিল। ফলে, প্রকৃতির যে রূপ-রস-গন্ধসমৃদ্ধ একটি রূপ তাঁর কাব্যে দেখা দেয়, সে প্রকৃতি আর কোন বাঙালী কবির কাছে সেই ভাবে ধরা দেয় নি। একটু নিরিবিলি—শান্ত পরিবেশ এই সহজ সরল মানুষটি পছন্দ করতেন। স্বল্পভাষী ও গম্ভীর বাহ্যতঃ হ'লেও ব্যক্তি হিসাবে জীবনানন্দ সরল—অমায়িক ছিলেন। কিন্তু, তাঁর প্রখর আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল। প্রয়োজন হ'লেও তিনি কোথাও অনুনয়ের ধার দিয়েও যেতেন না। অর্থের অভাব ঘটলেও অর্থের লোভ ছিল না। ইংরাজীতে কলিকাতা থেকে এম. এ. পাশের পর তিনি বিভিন্ন স্থানে অধ্যাপনা করেন। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে থাকাকালীন আমার সঙ্গে তাঁর যোগ হয়। তারপরেই এক বছরের ছুটী নিয়ে কলিকাতায় স্থায়ী কাজের উদ্দেশ্যে আসেন। তারপরে ব্যাঙ্কের কাজ নেন। 'স্বরাজ' পত্রিকার সম্পাদনায় যুক্ত থাকেন কিছুদিন। মধ্যে বাইরে ও মফঃস্বলে কাজ করতেন; যথা, খড়্গপুর কলেজ। প্রাইভেট ছাত্র পড়াতেন, প্রবন্ধ লিখতেন। বড়িশা কলেজে কিছুদিন কাজ করেন। শেষ পর্যন্ত হাওড়া উইমেন্স্ কলেজে ছিলেন। তাঁর পুত্র সমরানন্দ দাশ (আই. এস-সি.র ছাত্র), এম. এ.র ছাত্রী কন্যা মঞ্জুশ্রী, স্ত্রী লাবণ্য দাশ শিক্ষয়িত্রী। জীবনানন্দ ১৮৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

এ সমস্তই তো বাইরের কথা। জীবনানন্দের ভাবে বলতে পারি, স্মৃতির গহ্বর হলুদপত্রাচ্ছন্ন। বাষ্প উত্থিত স্মৃতিমূর্তির মুখ কখনও বিষণ্ন, কখনও রঙ্গে উজ্জ্বল।

সে মুক্তি চেয়েছিল একটু নিশ্চিন্ত অবকাশ কাব্যরচনার নিমিত্ত। জীবিকাটুকু উপার্জনের প্রয়াস ক্লান্ত করেছিল তাঁকে। যান্ত্রিক রুটীনের অঙ্গীভূত হওয়ার বিপক্ষে বিদ্রোহ ছিল তাঁর—অযোগ্যের অধীনতা ছিল অসহ্য। নিঃসঙ্গ এই বিহঙ্গ আত্মার স্বপ্ন ছিল নক্ষত্রে—নক্ষত্রে :

"সেই উষ্ণ আকাশেরে চাই যে জড়াতে
গোধূলির মেঘে মেঘে, নক্ষত্রের মত র'ব নক্ষত্রের সাথে!"

(অনেক আকাশ)

অবসর, লেখার জন্য অবসর কামনা ছিল তাঁর। তিনি পছন্দ করতেন সাহিত্যিক পরিবেশ ও নির্জনতায় লেখার মেজাজ তৈরি করা ও সাহিত্য পঠন। ছাত্রের মত অধ্যয়ন তাঁর কাম্য ছিল। মনের রূপ ছিল অনুসন্ধানী ; প্রতিটি বস্তুর, বিশেষতঃ বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের যথার্থ রূপ ধরবার প্রয়াস ছিল তাঁর। পড়তে তিনি ভালবাসতেন। ইংরাজি সাহিত্যের কোন কোন বই তাঁকে ধার দিয়েছিলাম। মনে আছে দুটি নাম শুধু, মমের 'থিয়েটার' উপন্যাস ও ক্রোনিনের 'দি ষ্টার লুক্‌স্ ডাউন' উপন্যাস তাঁর ভাল লেগেছিল। তিনি বিভিন্ন দেশের উপন্যাস ও কবিতার আলোচনা করতে চাইতেন। জর্মান লেখক টমাস্ ম্যানের রচনাকে তিনি আধুনিক উপন্যাসে শ্রেষ্ঠত্ব দিতেন। সত্যেন্দ্র দত্তের কবিতা ও এলিয়টের কবিতায় জীবনানন্দের অনুরাগ দেখেছিলাম। একটু প্রাচীন কবি, যথা মধুসূদন ইত্যাদির কবিতা তাঁর ভাল পড়া ছিল না। ইংরাজি গল্প-উপন্যাস অপেক্ষা কন্টিনেণ্টাল গল্প-উপন্যাস তিনি বেশী পড়েছিলেন। সমস্ত সাহিত্য-আলোচনার মূল সুর দেখতাম নিজের মতকে তিনি আমার মতেরও ভিত্তির উপর রাখতে চাইতেন। অন্যের কাছ থেকে নিজের সত্যকেও যাচাই করে নেবার এক প্রবৃত্তি।

কতকগুলো জাগতিক বিষয়ে দৃঢ়চেতা ও অনমনীয় হলেও জীবনানন্দ অন্তরঙ্গ ও সমধর্মী বন্ধুদের কথা উপেক্ষা করতেন না। পিতা সত্যানন্দ দাশ ধর্মপরায়ণ শিক্ষক, মাতা কুসুমকুমারী দাশ কবি। সন্তানের মনে শুচিতা বোধ ছিল প্রবল, রুচি ছিল

মার্জিত। কিন্তু, মনের গতি সেই প্রাচীন সমাজের মধ্যে সীমায়িত হয়ে রুচি-বাগীশের কলমে কিছু কবিতা লিখে ক্ষান্ত হয় নি। মাতার উত্তরাধিকারী তিনি হয়েছিলেন কাব্যক্ষেত্রে। কিন্তু, মাতা যখন লিখেছেন,

"বিপাসার তীরে ওঠে রবি"

পুত্র লিখেছেন :

"গেছে বুক—মুখ পরশিয়া
রাঙা রোদ,—নারীর মতন
এ দেহ পেয়েছে যেন তাহার চুম্বন
ফসলের ক্ষেতে !"

(পিপাসার গান)

স্পর্শ-স্বাদ-গন্ধে ভরা একটি জগতে কবি প্রবেশ করেছিলেন, সেখানে নৈতিক ধর্ম-শাসন ব্যর্থ। প্রি-রাফেলাইট কবি সুইনবার্ণের সঙ্গে অনেকে তাঁকে তুলনা করেছেন। আমরা আমাদের দেশের কোন লেখককে যতক্ষণ না বিদেশী মানদণ্ডে মাপ করতে পারি, স্বস্তি পাই না। জীবনানন্দ যে তাঁর নিজের মত, এ কথা বলতে আমাদের বাধে। প্রকৃতপক্ষে, গ্রামীন পরিবেশ রচনায় বাংলা-সাহিত্যে জীবনানন্দের সমতুল্য ছিলেন গদ্যকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পথের পাঁচালী'র সঙ্গে তুলনীয় জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনদর্শন কখনও পৃথক হ'লেও সাদৃশ্য প্রচুর। প্রাকৃতিক বা গ্রামীন পটভূমির যে সমস্ত অজানা, অচেনা বস্তুপুঞ্জ ইতিপূর্বে কারুর ভাবদৃষ্টিতে ধরা পড়ে নি, তাদের অন্তরঙ্গ রূপ আমরা প্রথম দেখলাম কবিতার মাধ্যমে।

"দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হ'য়ে ঝরেছে দু-বেলা

নির্জন মাছের চোখে ; পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে ;"

(মৃত্যুর আগে)

জীবনানন্দের কাব্য-সমালোচনা নিবন্ধের প্রতিপাদ্য নয়। মানুষ হিসাবে তাঁকে যে ভাবে দেখেছি, সেই সূত্র ধরে অনিবার্য কাব্য-স্মরণ মাত্র। কবি মায়ের মুখে বরিশালের লৌকিক ছড়ার উজ্জ্বলতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন শৈশবে। সে সব ছড়ায় অবশ্যই প্রাকৃত বাংলার ঘনবুনানি ছিল। তাই বোধ হয় কবি বন্য ভাষায় তাঁর স্বপ্নচারী সুদূর কবিতার মধ্যে মধ্যে অঙ্গরাগ করতেন।

"আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এ-পারে
বিয়োবার দেরি নাই—"

অথবা

"ডেকে নেবো আইবুড়ো পাড়াগাঁর মেয়েদের সব ;"

(অবসরের গান)

"মোর দেহ ছেনে গেছে অলস—আঢুল
কুমারী আঙুল—"

(পিপাসার গান)

"মানুষ যেমন ক'রে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে"—

(ক্যাম্পে)

এই অভিনবত্ব সর্বত্রই যে রুচিকর হয়েছে, তা নয়। কবিতায় অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে বর্বর আদিমতা জানিয়েছে কথ্য ভাষার মিশ্রণ ও সিমেণ্টের মত কবিতার গাঁথুনী পাকা করেছে অবলীলাক্রমে। এ ক্ষেত্রে কথার ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর মতামত কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞাতব্য।

জীবনানন্দের কবিতায় দুর্বোধ্যতা আছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু পৃথিবীর যে কোন ভাল কবিতা কি বহু সময়ে তাই নয়? সহজবোধ্যতাই সাহিত্যে উৎকর্ষের একমাত্র মাপ-

কাঠি নয়। ইদানীং কবি যে সমস্ত কবিতা লিখছিলেন, তাদের মধ্যের চিন্তাধারার যোগসূত্র পাঠকের কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। কখনো সাংবাদিকের প্রথায়, কখনো দার্শনিকের তন্ময়তায় কাটা-কাটা কথা সাজিয়ে গেছেন' অবচেতন মনে তাঁর চিন্তাধারার সংযোগ অবশ্যই ছিল; লিখিত পংক্তিগুলির অর্থ তাঁর নিজের কাছে সহজ। কিন্তু, পাঠক বিপন্ন হ'ন। তাই জীবনানন্দের কবিতার আবৃত্তি সহজ নয়। ভাল করে না বুঝে পাঠ করলে সে কবিতার অন্তর্নিহিত সঙ্গীত ও তাৎপর্য প্রতীয়মান হয় না। আবার ভালভাবে পাঠ করতে সক্ষম হ'লে বিরুদ্ধবাদীর মনও অর্থনির্ণয়ের পর আপ্লুত হয়ে যায়। এটি পরীক্ষিত সত্য।

জীবনানন্দকে একদিন বলেছিলাম তাঁর কবিতা দুর্বোধ্য। তিনি তাঁর অভ্যস্ত রঙ্গ-ভঙ্গিমায় প্রতিবাদ জানালেন। আমি কিছু না বলে দ্বিতল থেকে তাঁর একটি নবতম প্রকাশিত কবিতা নিয়ে এসে ওঁর হাতে দিয়ে বিনীত অনুরোধ জানালাম, "দয়া করে এটি একটু বুঝিয়ে দিন না।" আমার পূর্ব থেকেই ইচ্ছা ছিল ওঁর কবিতার অংশবিশেষ ওঁর কাছ থেকে বুঝে নেব।

জীবনানন্দ লজ্জিত-অপ্রতিভ হ'লেন। নিজের কবিতা যেন গোপন বস্তু, কোন মতেই দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে আলোচ্য নয়। অত্যন্ত অপ্রস্তুত মুখে তিনি নাগপাশ মোচন প্রয়াসী ব্যক্তির আকুলতায় বলে উঠলেন, "আজ থাক। পরে একদিন হবে।"

সেই মুহূর্তে তাঁর আত্মার একটি বিশেষ রূপ আমার চোখে পড়ল। আত্মগোপন। তিনি যে কবি, এই শোচনীয় ঘটনা বাইরের লোকের কাছে যেন তুলে ধরার নয়। সাহিত্য-আলোচনা ও মনুষ্য চরিত্র দর্শন কাম্য হ'লেও নিজের একান্ত ব্যক্তিগত কবিতা নিয়ে কবিরূপে জনতার সম্মুখে উপস্থিত হ'বার বাসনা তাঁর ছিল না। তাই সভা ও সভার ফুলের মালা তাঁকে খুঁজে পায় নি। তিনি লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। কখনও কোন সভায় নিয়ে যাওয়া যেত না তাঁকে। তাঁর কণ্ঠে তাঁর কবিতার আবৃত্তি অপূর্ব সুন্দর ছিল। কণ্ঠ তাঁর গম্ভীর পুরুষোচিত, যুক্ত হয়েছিল আবেগ। রেডিওতে তাঁর কাব্যপাঠ যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা জানেন কি অপরূপ মূর্ছনা ও আবেগে সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর স্পন্দিত হয়ে উঠত। তখন বোঝা যেত,

মাত্র তখনই বোঝা যেত, জীবনানন্দ দাশ কত বড় কবি। সেনেট হলের কবি-সম্মেলনে পঠিত 'বনলতা সেনে'র শেষ লাইন দু'টি আজও কানে বাজছে :

> "সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন ;
> থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।"

শ্রোতার বারম্বার অনুরোধে বিশাল সেনেট হলের ব্যাপ্তি মন্থন করে গভীর আবেগ-ধর্মী কণ্ঠ একটির পর একটি কবিতা পাঠ করে যাচ্ছিল। জীবনানন্দ যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি, নিঃসন্দেহে সেদিন প্রমাণিত হয়েছিল।

জনপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহুল পঠিত রচনা। আজ তরুণ কবিদের মধ্যে শতকরা আশিজন জীবনানন্দের অননুকরণীয় ভঙ্গিতে কবিতা লিখবার চেষ্টা করছেন। তাঁর পুস্তকগুলির বহু সংস্করণ হয়েছে। যখন সাধারণ তাঁকে চিনতে সুরু করেছে, ও তাঁর সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উৎসুক হয়ে উঠেছে, তখনি তাঁর ঘটলো অকালমৃত্যু।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরের যুগ অত স্বপ্নভারাতুর রূপকথার রাজকন্যা নয়। 'ঝরা পালক' ছিল কবির প্রথম কাব্য-পুস্তক—স্বকীয়তা প্রাপ্তির পূর্বে নকলনবীশ রচনা। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' অন্য এক জগতের চিহ্ন রেখে গেল জীবনানন্দের কাব্যধারায়। প্রেমের ব্যথার মধ্যে কবি নিজেকে খুঁজে পেলেন, আর খুঁজে পেলেন পরিচিত জগতের নূতন রূপ।

> "জীবনের পরে থেকে যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার,
> কবর খুলেছে মুখ বার বার যার ইসারায়,
> বীণার তারের মতো পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষার তার
> তাহার আঘাত পেয়ে কেঁদে কেঁদে ছিঁড়ে শুধু যায়!
> একাকী মেঘের মতো ভেসেছে ভেসেছে সে—বৈকালের আলোয়—সন্ধ্যায়!"

সমস্ত জীবনে তাঁর লেগেছে ম্লান গোধূলীর আলো, বিষণ্ণ হেমন্ত। তাঁর কবিতার বিষাদ ও বেদনাবোধ তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সম্পদ। সমগ্র কাব্য আচ্ছন্ন করে বাজে :

"আরো-এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;"

(আট বছর আগের একদিন)

জীবন ও মৃত্যুর ঘন বুননের মাঝে মাঝে দূরের আকাশের ক্ষণদৃশ্য কবিকে উদাস করে দিত। বিরাট পটভূমিকায়, সামগ্রিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কাব্য। অনেক দূরের দেশে, অনেক বড় অতলে ছোট কবিতা হারিয়ে যেত। বিভূতি ভূষণের জীবনদর্শনের জন্মমৃত্যুর রহস্য আড়ালে এক ও অখণ্ড—

"আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,"—

(বনলতা সেন)

জীবনানন্দের প্রধান বিশেষত্ব ছিল এক ধরণের ধী-নির্ভর হিউমার।
দারুণ রোমান্টিক এই কবির লজ্জাজড়িত স্বল্প ভাষণ এবং নিঃসঙ্গ স্বভাব বিভক্ত হ'ত চমৎকার হিউমারের অনুশীলন ও ইঙ্গিতে। তাঁর সঙ্গে আমার কথার যোগ ওখানেই ছিল—অল্প কথায় বুঝে নিতে পারা যেত পরস্পরের বক্তব্য ও হাস্যের সেতুবন্ধ রচিত হ'ত নিমেষমাত্রে। এই শ্রেণীর হিউমার বর্জিত লোকদের আমরা 'the other type' বলতাম। কোন অন্তরঙ্গ ব্যক্তির কথা জিজ্ঞাসায় আমি অর্থবাচক প্রশ্ন করতাম, "উনি কি—?" জীবনানন্দ তাঁর চিরঅভ্যস্ত বক্র-হাস্যে উত্তর দিতেন, "unfortunately, the other type !"—একটুক্ষণ বিস্ফারিত চক্ষে অন্যের দিকে চেয়ে উনি তার মুখে সায় খুঁজতেন, তারপর হঠাৎ অতি উচ্চস্বরে প্রাণখোলা হাসি হাসতেন। তাঁর হিউমার অন্যে ঠিকমত বুঝতে পারল কি না যাচাই করে নেওয়ার পরে তবেই তাঁর দুর্লভ উচ্চহাস্য শোনা যেত। নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ সর্বদাই নিজের পালকের পাখি খুঁজতেন নিঃসংশয়ে।

এই রঙ্গবোধে তিনি 'শনিবারের চিঠি'র 'সংবাদ সাহিত্যে'র নিয়মিত পাঠক ছিলেন—তাঁকে গালাগালি সত্বেও। একদিন আমরা 'শনিবারের চিঠি'র হিউমার নিয়ে আলোচনারত ছিলাম। সম্পাদক জীবনানন্দ দাশকে সুমধুর বিশেষণে আপ্যায়িত করতেন। অথচ জীবনানন্দের তাতে কৌতুকের অন্ত ছিল না। আমি সান্ত্বনাচ্ছলে বললাম, "বর্তমান যুগ প্রচারের যুগ। সজনীবাবু আপনার যে পাব্লিসিটি করছেন, সেজন্য তিনি ফী চাইতে পারেন।"

"ঠিক বলেছেন।"

"একদিন আলাপ করবেন? অত হিউমারের ভক্ত আপনি।"

"হ'বে, হ'বে।"

সেইদিন বিদায়কালে জীবনানন্দ দাশ বলে গেলেন অনাবিল আনন্দের সঙ্গে—"সজনীবাবুকে বলবেন, এমনি ভাবেই যেন আমার আরো প্রচার করেন। হা, হা, হা!" সেই হাসির প্রত্যেকটি ধ্বনি যেন বলে দিল, লুকোচুরি খেলায় সজনীকান্তের হার হয়েছে। প্রকৃত ব্যক্তি যে, তিনি চিরপলাতক। ছায়াকে বিদ্রূপের বাণবিদ্ধ করবার চেষ্টায় জীবনানন্দকে বিন্দুমাত্র আঘাতও কোন সমালোচক দিতে পারেন নি।

কদাচিৎ, কোন মুহূর্তে হয়তো জীবনানন্দের বাহ্যব্যবহারের কোন অংশে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাহ্যব্যবহারের সঙ্গে ক্ষীণ সাদৃশ্য লক্ষিত হ'ত। কিন্তু, বিভূতিভূষণ গদ্যশিল্পী—তাঁর বাহ্যব্যবহার কখনও বা অভিনেতা-সুলভ ছিল, রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপের উজ্জ্বলতম আলোকসম্পাতের স্থানটি অধিকারের প্রয়াস পরিলক্ষিত হ'ত। আর, জীবনানন্দ ছিলেন অন্ধকারতম কোণটুকুর প্রত্যাশী। তাই তাঁর উদাসীনতা বা নির্জন প্রকৃতি-প্রিয়তা বা সরল অনাড়ম্বর আরও অনেক হৃদয়স্পর্শী। তবু, রচনার দিক থেকে গদ্য ও কাব্য-সাহিত্যে এই দুই শিল্পীর অবদান তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা চলে।

জীবনানন্দ সম্পর্কে সহজ কতকগুলি বিশেষণ আমরা পাই—তাঁর কবিতা

চিত্রকল্প, তিনি হেমন্তের কবি। তিনি উপমাবিলাসী। দৃশ্য-জগতকে শুধু চিত্রকল্পে অঙ্কিত করে তিনি ক্ষান্ত নন, অন্য দৃশ্য-জগতের সঙ্গে তাকে উপমায় প্রতিষ্ঠিত করে তবে যেন তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট হ'ত। 'মত' কথাটির বহুল-ব্যবহার তাঁর কাব্যে বিশেষত্ব, কখনও বা মুদ্রাদোষ। এখানেও স্বভাবগত যাচাই করার অভ্যাস দেখা যায়।

"আশঙ্কা ইচ্ছার পিছে বিদ্যুতের মত কেঁপে ওঠে!
বীণার তারের মত কেঁপে কেঁপে ছিঁড়ে যায় প্রাণ!
অসংখ্য পাতার মত লুটে তারা পথে পথে ছোটে,—
যখন ঝড়ের মত জীবনে এসেছে আহ্বান!
অধীর ঢেউয়ের মত—অশান্ত হাওয়ার মত গান
কোন্ দিকে ভেসে যায়!"

(জীবন)

লক্ষ্যণীয়, পংক্তিগুলি পাশাপাশি। কিন্তু, এখানে মুদ্রাদোষ মাধুর্যরচনায় ব্যাঘাত ঘটায় না। জীবনানন্দের কাব্যে এক কথা বারবার ব্যবহার আছে, শিথিল আলস্যে নয়। তিনি কখনই শিথিল কবি ছিলেন না। সঙ্গীতধর্মী তাঁর এই কবিতাগুলি বারবার এক শব্দ, এক ধ্বনি দিয়ে গানের ধুয়া সৃষ্টি করে থাকে। নূতন পথের পথিক ছিলেন কবি। রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিপরীত পথে আজ পর্যন্ত যত আধুনিক কবি চলে গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বকীয়তাসম্পন্ন কবি ছিলেন জীবনানন্দ দাশ। আঙ্গিক, ভাষা ও ভাবের আমূল পরিবর্তন সূচিত হ'ল তাঁর নিঃসঙ্গ মনের নিজধর্মে বহিঃপ্রকাশের মধ্যে। চিন্তার গতি তাঁর ছিল ভিন্ন, অসাধারণ ও বঙ্কিম। লাজুক, স্বল্পভাষী, নির্জনতার কবি কিন্তু নিজের চিন্তাধারার যথাযথ ও অবাধ বহিঃপ্রকাশে যে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, সে সাহস কেবলমাত্র যুগস্রষ্টার থাকে। বিদ্রূপ, অনাদর, উপদেশ কিছুই তাঁকে নিজের পথ থেকে স্খলিত করে সহজগম্য পথে চালাতে পারে নি। তিনি নিজে যা ভাল বুঝেছিলেন, সেই পথে একনিষ্ঠ ছিলেন শেষ পর্যন্ত।

তাঁর মানসিক শক্তি অনুকরণযোগ্য। সাম্প্রতিক কবিতার তিনি ছিলেন জনক। তাঁর কবিতার প্রথম যোগ্য সমালোচক বুদ্ধদেব বসু। পুনরাবৃত্তি, উপমা, পংক্তির অসামঞ্জস্য, আরও নানারূপ প্রক্রিয়া অভূতপূর্ব ভাবপ্রকাশের জন্য কবিকে ব্যবহার করতে হয়েছে। ইচ্ছাকৃত পুনরাবৃত্তি তাঁর বিশেষত্ব। কতকগুলি সংজ্ঞা কবিচিত্তের গভীরে এমন স্থায়িত্ব নিয়ে বসে ছিল যে, নানা কবিতার মধ্যে তাদের পুনঃপুনঃ প্রকাশ মনকে বিস্ময় বা অভিনবের আস্বাদে চকিত—উত্তেজিত করে তোলে না। ক্রমাগত পাই—চিল, পাখি, হরিণ, পঁ্যাচা, বেতফল, ধান, শস্য, ঘ্রাণ, সমুদ্র, জল, আকাশ, মানুষী, মাংস, ইত্যাদি কথার মধ্য দিয়ে কবিমেজাজের প্রকাশ। সমস্ত কবিতা যে বিষণ্ণ-মধুর লোকে প্রয়াণ করতে চায়, সেই লোকের পরিবেশরচনায় কথাগুচ্ছ নিঃসন্দেহে সাহায্য করলেও কবিমনের কথন-স্থাবরবৃত্তির পরিচায়ক।

নিজের জগতে নিমগ্নচিত্ত কবির মৌলিক প্রতিভার বাহন যে আঙ্গিক বা ভাষা হয়েছিল, ইংরাজি কবিতার স্বাদবঞ্চিত বাঙালীর কাছে হয়তো বা কখনও অর্থহীন প্রতিপন্ন হ'তেও পারে। যথা, 'ঘ্রাণ' কথাটি কবি প্রায় সর্বদা ইংরাজি অর্থে ব্যবহার করেছেন। শব্দগঠনও বহুলপরিমাণে পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত। বিশদ আলোচনার ক্ষেত্র অন্যত্র।

অতিরিক্ত সমাজ-সচেতন সমালোচক জীবনানন্দের লিরিকশ্রেণীর কবিতায় বর্তমান জগৎ থেকে পলায়নী প্রবৃত্তি দেখতেন ও আধুনিক সমাজের কোন প্রতিফলন না দেখে অতৃপ্ত থাকতেন। ইদানীং-রচিত কবিতায় জীবনানন্দের মধ্যে কবিচিত্তের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক জগতের যোগসাধনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। নিঃসন্দেহে তাঁর কাব্য অন্য জগতের সন্ধানে ভ্রাম্যমান হয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বদিনে রেডিওতে পঠিত 'মহাজিজ্ঞাসা' কবিতাটির প্রশ্ন শেষ করে যেতে পারলেন না কবি।

মানুষ হিসাবে জীবনানন্দকে দেখা প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য ছিল। তাই কাব্যের পংক্তি স্বতঃই মনে এসেছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' আমার প্রিয় পুস্তক, তাই বেশী

উদ্ধৃতি ও-বই থেকেই। বিগত পূজাসংখ্যায় যে কবিতাগুলি ছিল, তারা পরীক্ষামূলক প্রধানতঃ

"তবুও মহাজিজ্ঞাসা ও অপার আশার কালো
অকূলসীমা আলোর মত ; —হয়তো সত্য আলো।"

(অবিনশ্বর, শারদীয়া পূর্বাশা)

সুতরাং সঠিক মতামত সহজসাধ্য নয়।

যে আবেগ পূর্বতন কাব্যের প্রাণ ছিল, ইদানীং-রচিত কাব্যে সেই আবেগ আস্তে সরে যেয়ে প্রত্যক্ষ ও বর্তমান জগতকে স্থান দিচ্ছিল। প্রেম কথন-প্রতিপাদ্য হ'লেও করুণ-গম্ভীর আত্মসমর্পণ নয়। জগতকে বাইরে রেখে মনে দ্বার দেওয়া নয়।

অথচ, জীবনানন্দের নির্জনতাপ্রিয়তার মধ্যে লক্ষ্যণীয় ছিল এই যে, শহরের প্রাণকেন্দ্রে তিনি থাকতে ভালবাসতেন। তাঁর গ্রামীন কবিতা সত্বেও এই দিক থেকে মানসিক প্রবণতা নাগরিক ছিল। যেখানে সভ্যতা বা সংস্কৃতি নেই, সেখানে শুধু প্রকৃতি অথবা নির্জনতা নিয়ে তিনি থাকতে পারেন নি। অনেক লোকের মধ্যে নিঃসঙ্গতা তাঁর ধর্ম ছিল। আমার বাড়ীতেও জনসমাগমহেতু তিনি আসতেন কম।

সেদিন শবযাত্রার দিন দেখলাম অসংখ্য শাদা ফুলে-ছাওয়া তাঁর শরীর,—আমার হাত শূন্য। দুটি দিন মনে পড়ল। স্মরণীয় তারা।

ওঁর বাড়ী থেকে সন্ধ্যাবেলায় জীবনানন্দ আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিচ্ছিলেন। পথে ফুলের দোকান। শাদা বেলফুলের মালা কিনলাম। কবি বললেন, "হ্যাঁ, আমারও এই মত। টেবিলে জল দিয়ে সাজিয়ে রাখলে অনুপ্রেরণার মত একটা কিছু—", হাসতে হাসতে তিনি উপহৃত মালা পকেটে তুলে রাখলেন সযত্নে।

আরও একদিন কবির সঙ্গে ফিরবার পথে একঝাড় রজনীগন্ধা কিনলাম।

বাড়ীতে কলসীতে সাজালাম কবির সম্মুখে। আমার কতকগুলি অপ্রকাশিত ও সদ্য-রচিত কবিতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করবার কথা চলছিল—অন্য ধরণের কবিতা—বন্য প্রেমের। তিনি আগ্রহসহকারে সবগুলিই শুনলেন ও বারবার অনুরোধ করলেন সেগুলি প্রকাশিত করতে। ফুলের গন্ধ যে পরিবেশ রচনা করে, সেদিনও কবি আলোচনা করলেন নিজের পুষ্পপ্রীতি প্রদর্শন পূর্বক। জীবনানন্দ যে কত বড় ও কত আন্তরিক কবি সেদিন অনুভব করেছিলাম আমার কবিতার প্রতিক্রিয়া তার ওপরে দেখে। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও স্মরণ করছি, আমার কাব্যপুস্তক 'জুপিটার' তিনি সমালোচনার্থে স্বয়ং বুদ্ধদেব বসুর হাতে দিয়ে এসেছিলেন ও বিরুদ্ধ সমালোচনা হ'তে পারে দুশ্চিন্তায় উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছিলেন। 'পূর্বাশা'য় আমার 'সপ্তসাগর' বইখানির সমালোচনা করবেন নিজে, এই ইচ্ছায় তিনি নিজে থেকে বইখানি নিয়ে গিয়েছিলেন। সময়াভাবে হয়ে ওঠে নি। উনি বাসস্থানের গোলমালে বিব্রত ছিলেন। তবু অপার কৃতজ্ঞতায় তাঁর প্রচেষ্টা স্মরণ করছি।

কবি-সম্মেলন থেকে আমরা একসঙ্গে ফিরছিলাম। পথে অনেকক্ষণ উদাস নীরবতায় আকাশ লক্ষ্য করে অবশেষে কবি সহসা বলে উঠলেন, "আপনার সেই কবিতাগুলো? ছাপা হ'লে আমাকে কিন্তু এক কপি দেবেন।"

বুঝতে পারলাম, তাঁর মনে সর্বদা কবিতার সুর বাজে। আমার যতটুকু মূল্য তাঁর কাছে, সেটুকু আমি কবিতা লিখি বলেই, সাহিত্যিক বলেই। অনেক লোকের কোলাহল-মুখরিত নগরে ইনি তো নিজের নিঃসঙ্গ কাব্যজগৎ নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকতে পারেন। এই যে চারপাশে ট্রাম-বাস, লোকজন, কিছুই ওঁর চোখে পড়ছে না, মনেও প্রবেশ করছে না। অথচ, উনি তো কলকাতায় থাকতেই ভালবাসেন। কবিধর্ম কিন্তু নির্জন পল্লীর স্বপ্নে মগ্ন! তবে?

বুঝতে পারলাম, কবি নাগরিক জনতার মধ্যে থাকতে ভালবাসেন কারণ জনতা সময় বিশেষে চমৎকার আড়াল রচনা করতে পারে। জনতার অন্তরালে নিজেকে আবৃত করে লুকিয়ে থাকা চলে। মফঃস্বল শহরে ব্যক্তির যে আড়াল

থাকে না, তিনি প্রকট হয়ে পড়েন।

সেই পুষ্পসমাকুল দিন দুইটি এই খানেই শেষ হয়ে গেল— এই শবযাত্রার বেল-রজনীগন্ধার স্তূপে! সেখানে বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব হয় নি।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে হ'ল, জীবনানন্দ একদিন কি সতৃষ্ণভাবে বলেছিলেন, "আপনার বাড়ীটায় যদি থাকতে পারতাম তবে কি ভালভাবেই না লিখতে পারতাম! লিখবার অবকাশ বা নির্জনতা পাই না। উপন্যাস লিখব ভাবছি। কত কি লিখবার আছে। আপনার ঘরটি যদি পেতাম!

সে দিন যে উত্তর দিয়েছিলাম, মনে বিস্তৃততর হয়ে ফিরে এল ঃ যে সাহিত্যিক নিজের অক্ষমতা পারিপার্শ্বিক নির্ভর মনে করতে পারে না, তার যন্ত্রনা যেন আপনার কখনও অনুভব করতে না হয়। প্রতিভার স্বাক্ষর নিয়ে জন্মগ্রহণ করে যদি প্রেরণাবিহীন প্রতিভার অবসাদ বহন করতে হয়, তার চেয়ে মৃত্যু ভাল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জীবনানন্দ অবসাদের পূর্বেই বিদায় নিতে পেরেছেন।

কাছের জীবনানন্দ

সুচরিতা দাশ

সেই এক গল্প ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে, যাঁরা অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের একজনকে নাকি পরীতে পেয়েছিল। জ্যোৎস্না-রাতে ধানক্ষেতের উপর দিয়ে তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে যেত পরীরা, ভোরের আলোয় তাঁকে পাওয়া যেত শিশির-ঝলমল সোনার ধানক্ষেতের পাশে। তাঁর বিছানায় ছড়ানো থাকত কাঁচা লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি। তারপর বহুযুগ পার হয়ে গেছে। এঁদেরই উত্তরপুরুষ জীবনানন্দ।
সত্যানন্দের প্রথম পুত্র। ঠাকুরদাদা সর্বানন্দ দাশগুপ্ত। পদ্মাপারে বাড়ি। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে গাউপারা গ্রামে। সে গ্রাম আজ আর নেই, কীর্তিনাশা পদ্মার সলিলে সমাধি লাভ করেছে। সর্বানন্দ কার্যোপলক্ষে এই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বরিশালে এসেছিলেন। পরে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। এ ধর্ম গ্রহণের পর বৈদ্যত্বের চিহ্নস্বরূপ 'গুপ্ত' কথাটাকে অপ্রয়োজনীয় বোধ করেছিলেন তিনি; তারপর থেকে আমাদের পরিবার 'দাশ পরিবার' নামে পরিচিত। দেশের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক একরকম ঘুচেই গেল, বরিশালেই স্থায়ী বসবাস সুরু হোলো। সর্বানন্দের দ্বিতীয় সন্তান সত্যানন্দ। আমাদের বাবা।

বাবার কথা মনে পড়লেই তাঁর ধ্যানগম্ভীর প্রশান্ত উদার মুখচ্ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমাদের ঋষিকল্প বাবা যেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মিক শিষ্য, ও তাঁরই আত্মজ দাদা তাঁর জ্ঞানের গভীরতার, মননের ঔজ্জ্বল্যের, মানসিকতার স্বচ্ছতার উত্তরাধিকারী। তাঁর প্রজ্ঞার আলোকে প্রতিভাসিত দাদা তাঁর আজীবন সত্যসন্ধানের উত্তরসাধক, তাই বাবার সম্বন্ধে দাদার উক্তি তাঁর নিজের মানসিক গঠনসৌকর্য অনুধাবন করতে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। দাদা লিখেছেন, "একমাত্র জ্ঞানযোগই যে বাবার অন্বিষ্ট ছিল সে-কথা সত্য

নয়, কিন্তু মধ্যবয়স পেরিয়েও অনেকদিন পর্য্যন্ত সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান—এমন কি গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় তাঁকে প্রগাঢ় হয়ে থাকতে দেখেছি—মানুষের জীবন ও চরাচর সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব একটা বিশুদ্ধ ধারণায় পৌঁছবার জন্যে। নিজের হিসেবে পৌঁছতে পেরেছিলেন তিনি। উচ্ছ্বাস দেখিনি কখনও তাঁর, কিন্তু জীবনে অন্তঃশীল আনন্দ স্বভাবতই ছিল—সব সময় প্রায়। কিছু গদ্য ছাড়া বাবা সাহিত্য সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেননি, কিন্তু পাঠ করেছিলেন অনেক, আলোচনার প্রসারে ও গাঢ়তায় আমাদের ভাবতে শিখিয়েছিলেন, দৃষ্টি তিনিই খুলে দিয়েছিলেন।"

বাবা যদি তাঁকে ভাবতে শিখিয়েছিলেন, যদি তাঁর অন্তর্দৃষ্টির প্রসারতা নীলিমালীন করে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তবে তাঁর পাখির পালকের চাইতেও নরম অনুভবের মেদুরতা, বলা যায়, মার কাছ থেকে প্রাপ্ত। বাবা যদি দিয়ে থাকেন তাঁকে সৌরতেজ, প্রাণবহ্নি, তবে মা তাঁর জন্যে সঞ্চয় করে রেখেছেন স্নেহ-মমতার বনচ্ছায়া, মৃত্তিকাময়ী সান্ত্বনা। তাঁর জন্যে মা একটি নিরিবিলি পরিবেশ, শান্তমধুর আবহাওয়া রচনা করে দিতেন সর্বক্ষণ। যাতে সেই ঘন একান্ততাকে খণ্ডিত করে না দেয় আমাদের বৃহৎ পরিবারের কোলাহল, কর্মব্যস্ততার কলরব, তার দিকে মা'র সজাগ দৃষ্টি ছিল প্রতিটি মুহূর্তের। তিনি যেন ছিলেন দাদার জীবনের সেই পল্লবঘন স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন তরুশাখা—যাতে লগ্ন হয়ে একটি কোমল-কাতর লতিকা বেড়ে ওঠে, ফুলসম্ভারে বিকশিত হয়। জীবনের শেষের দিনগুলোতে দুঃসহ যন্ত্রণায় মুহ্যমান হয়ে থেকেও তাঁর যেন চিন্তার অন্ত ছিল না আর—একই চিন্তা, দাদাকে বেষ্টন করে। তিনি ভেবেছেন, আর আকুল হয়েছেন। তিনি চলে গেলে দাদার জীবনে যে-মহাশূন্যতা হাহাকার করে উঠবে, সেই ফাঁক পূর্ণ হবে কি দিয়ে, যে-অনুবেদনাসিক্ত আশ্রয় ভেঙে যাবে তা আর গড়ে উঠবে কি করে!

শিশিরস্নানের শেষে নম্র কোমল প্রত্যুষা পূর্বগগনে আবির্ভূত হতে-না-হতেই বাবার মন্দ্রমধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হোতো ঔপনিষদিক শ্লোক। সহসা সমস্ত পটভূমি

প্রসারতায় থম থম করত নিলয়স্রোতে, থর-থর করে কাঁপত যেন সার্বিক প্রকৃতি-ছন্দ—প্রকৃতির ছোট-বড়ো সখা-সদস্য ফুল, লতা, ঘাস। বাতাসের আড়ালে যেন কে আসছেন, আসছেন বলে মনে হোত। যেন কোন সময়ব্রহ্মের আসন বিপুলতাকে সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে এসে এই এক প্রভাতবেলার সানন্দ মধুময় সীমিততায় ভাবের অধীরতায় টল-টল করতে থাকত। সে আমাদের ছোট-বেলার গল্প। সঠিক প্রতিটি রেণুকণা স্বরূপে স্মৃতির তহবিল হাতড়ে তুলে আনা কষ্টকর, বুঝি অসম্ভব। তবু সেই গভীর প্রশান্ততার মতো স্পন্দনশীল প্রভাতবেলাগুলোর ভার যেন বুকের সুখনিঃশ্বাসের কোল ঘেঁষে কেমন জেগে ওঠে; মনে হয়, সেই গম্ভীর গাঢ় আনন্দের আবহাওয়ায় বুঝি দাদারই স্বচ্ছন্দতা ছিল বেশি। 'কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা।' ('ময়ূখ', হেমন্ত, ১৩৬১)—কবিতার বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন দাদা। ইতিহাস-চেতনা কি? তা নিয়ে ভাববার স্থান এ নয়, তবে এটুকু বলা যায় যে, সংক্ষিপ্ত অর্থে ধরলে তা নিখিল মানব-মানসিকতার অনাদিকাল ধরে যে নিশ্চিত একটি-মাত্র আনন্দময় ধ্রুবলোকে নির্ধারিত যাত্রা, তার ধারাসরণিকে ঐ সংজ্ঞায় বিশেষিত করা যায় হয়ত; আর ইতিহাসের সুরু যদি উপনিষদে-বেদে, যদি মানব-মানসের জ্ঞানযোগ অমোঘ ধ্রুবের জন্যে, 'সত্য আলো'র জন্যে নিরুদ্বেগ উদ্বেল কালপ্রবাহের সেই সূচনাতে, তবে আমাদের ছোটবেলায় বাবার কণ্ঠনিঃসৃত উদাত্ত গম্ভীর শব্দলহরীকে কেন্দ্র করে যে-উষাকাল,—সম্পূর্ণ করে নিলে, বাবাকে ঘিরে-ঘিরে যে-শান্তি-সমাহিতির জীবনস্থিতি-তাতে যেন দাদার সানন্দ স্বচ্ছলতা তাঁর পরবর্তী জীবনের নিষ্ঠ অভিনিবেশের শান্ত মগ্নতার অঙ্কুরোদ্গমে জলবায়ুর প্রশ্রয় দিয়েছিল।

আর তাঁর পাশাপাশি মা। তাঁর প্রশ্রয় বীজের অঙ্কুরোদ্গমে জলবায়ু ছাড়াও যে আরেকটি আশ্রয়ের সান্ত্বনা দরকার, তাতে। তিনি মৃত্তিকার মত দাদার জীবন গঠনে। দাদার সম্পর্কে অনেক জনশ্রুতি প্রচলিত। তিনি জীবন থেকে পালিয়েছেন। তিনি মানুষের সখ্য সহ্য করতে পারেন না। তিনি নির্জন,

তিনি নিরিবিলি। সব কোলাহল থেকে দূরে। এ-সব বাক্যগঠনের সত্য-সততা কতটুকু তা আমার বিবেচ্য নয়, যদিও এ-সবের অনেকগুলোই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে হয়ত এতদিনে, তবু না-বলে উপায় নেই, দাদা একটু সস্নেহ আশ্রয়ের জন্যে কিঞ্চিৎ অসহায় ছিলেন আজীবন। তাঁর নিজের অস্তিত্ব ও তার জন্যে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনগুলোকে যেন তিনি একা গুছিয়ে নিতে পারতেন না, যেন সব এলোমেলো হয়ে যেত, হারিয়ে-হারিয়ে যেত, অথচ তিনি অগোছালো থাকতে ভালবাসতেন না। এই সহজ অভিভাবকত্বের আশ্রয়টুকু পুরোপুরি পেয়েছিলেন তিনি মা'র কাছ থেকে। দাদা যে ঠিক সাংসারিক মানুষ নন, তাঁর জীবনের বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন যে চরিতার্থতা লাভ করেনি, ভাগ্যের প্রসন্ন দৃষ্টি যে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি লাভ করলেন না, সেজন্যেই অন্তত তাঁর কাব্য-সাধনার জন্যে একটুখানি অনুকূল পরিবেশ থাক, আর সেইখানে থাক অন্তত একটু সান্ত্বনা, সারাজীবন ধরে সেই চেষ্টাই করে গেছেন মা।
মা'র মধ্যে যে সহজ স্বাভাবিক কবিমানস স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছিল, অথচ ছিল প্রায় অস্ফুট, যা কেবলমাত্র বাঙ্‌লাদেশের শিশুদের অতি-পরিচিত

ছোট নদী দিনরাত বহে কুলকুল,
পরপারে আম গাছে থাকে বুলবুল—

অথবা,

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে—

এ-রকম দু-চারটে কবিতা, এবং বরিশালের 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকার কিছু কবিতার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেল, বৃহৎ পরিবারের বিচিত্র অজস্র কাজকর্মের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করে যার সাধনা তিনি করলেন না—তারই বিকাশ, সাধনা ও সিদ্ধি দাদার মধ্যে প্রত্যক্ষ করে হয়ত তিনি নিজেকে সার্থক মনে করতেন। তাই, আমার কাছে লেখা মা'র এমন অনেক চিঠি আমি এখন উদ্ধৃত করতে পারি,

যার প্রতিটি পংক্তিতে দাদার জন্যে তাঁর অপরিমেয় ব্যাকুলতার প্রতিভাস ছড়িয়ে রয়েছে।

শৈশবে কঠিন পীড়ায় দাদাকে আক্রান্ত হতে হয়েছিল একবার—বাঁচবার আশা ছিল না। মা আর দাদামশায় তাঁকে নিয়ে ঘুরলেন কত স্বাস্থ্যনিবাসে, কত বিভিন্ন জলবায়ুর জনপদে—লখ্‌নউ, আগ্রা, দিল্লী। সেদিন আমাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল না; পুরোনো চিঠিপত্র থেকে জানতে পারি মা'র এই প্রচেষ্টাকে পরিবার-পরিজন সকলেই আত্মঘাতী বলে মনে করেছিলেন। তবু বিচলিত হন নি মা। পশ্চিমে দীর্ঘদিন কাটিয়ে সেই শিশুকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তিনি ফিরে এসেছিলেন।

এমনি করে বাল্য ও কৈশোর কেটেছে মায়ের মমতার আশ্বাসে-আশ্রয়ে,অন্তরালে, বাবার জ্ঞানযোগী প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বের সৌরতেজের উত্তাপে, 'ভাবতে শেখার' উন্মেষে। আর বাকীটুকু ভরাট করে ছিল বই আর বই, বাগানের ভাণ্ডারে বিচিত্র রঙে-রসে মন ভরিয়ে দিয়ে অপার অজস্র ফুল আর ফুল। তার সব উপকরণ আর উপহার নিয়ে সজল শ্যামল প্রকৃতি, বরিশালের সবুজ প্রাণময়তায় আকুল বিস্ফারিত প্রকৃতি, যার হয়ত বর্ণনা দেওয়া চলে না। মনটা তখন নদীর মত টলমল করে বয়ে যাচ্ছে, তাতে কত রঙের খেলা ফুটে উঠছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। আকাশে অনাদি অনন্ত ইন্দ্রনীল আর ধরণীর দিগন্ত ছুঁয়ে আস্তীর্ণ শ্যামলতা নয়ন মন মগ্ন করে রেখেছে, চেতনায় জ্বালিয়ে দিয়েছে সলজ্জ-শিখা ভালো-লাগার দীপ, যাই-না-কেন দু'চোখ ভরে দেখো বিস্ময়ে বিদীর্ণ হয়ে যাও, সবকিছুকে ভালো-লাগার ভালোবাসার আনন্দে থর-থর করে কাঁপো—এমনি মোহমেদুরতা সে দীপের আলোয়। অস্ফুট শৈশব থেকে প্রাণময় কৈশোর ও যৌবনের দীর্ঘদিন কেটেছে বরিশালে—এমনি করে।

সেই সব মধুঝরা দিনগুলোর স্মৃতি এলোমেলো ভেসে আসে। মন তখন যেন সব কিছুতেই মুগ্ধ আর বিস্মিত হবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। ঠিক তেমনি সময়ে দাদার কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হতে শুনতাম নানান্ কবিতার পংক্তি। সেই ললিত

ধ্বনির ঝঙ্কার, শব্দের মূর্ছনা মনকে যেন উড়িয়ে নিয়ে যেতো এক আধো-বোঝা, আধো-না-বোঝা রূপলোকে, যেন মগ্ন করে দিত এক অনির্বচনীয় আনন্দলোকে, যে আনন্দের স্বরূপ বুঝি না, ধরতে পারি না, কিন্তু মনে-মনে ছুঁয়ে থাকি তার অবশ বিমুগ্ধতা। দাদা রোদে ইজিচেয়ারে বসে-বসে কত-কি লিখতেন; তখন তাঁর ছবি আঁকার নেশা ছিল, আলতো পেন্সিলের মৃদু চঞ্চলতায় অস্ফুট আলো-ছায়াময় কতই-না ছবি ফুটে উঠত; কখনো আকাশে দু'চোখ মেলে দিয়ে কেমন স্তব্ধ চেতনায় গাঢ় বিলুপ্তিতে ডুবে যেতেন। অবাক হয়ে দূর থেকে বা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতাম. ভাবতাম, রোদে পিঠ পেতে ইজিচেয়ারে বসে দাদা এত কি লেখে! কখনো কলম চলে দ্রুতগতিতে, কখনো লালফুলের আস্তরণে মুড়ে থাকা কৃষ্ণচূড়ার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে ধ্যানস্থ হয়ে যান। কবিচিত্তে তখন মধুচ্ছন্দা ঝর্ণাধারার অমৃতময় প্রবাহ বয়ে চলেছে। তখন বুঝতাম না, আজ বুঝি, কি-করেই-না রূপরাজ্যের খোলা নীলিমার কোলে পথ হারিয়ে-হারিয়ে ফেলত একটি সুকুমার সৌন্দর্যমগ্ন চিত্ত, যতই সে আর অনুভবে চেতনায় বিন্যস্ত করে করে পার পায় না সেই অমেয় বিপুল সৌন্দর্যতৃষার চরিতার্থতার, ততই যেন আরো বেশি করে ক্লান্ত হয়ে ওঠে।

মাঝে-মাঝে কাছে গিয়ে দেখবার চেষ্টা করতাম, দাদা কি লিখছে। দাদার লেখা তখন ছিল খুব ছোট ছোট আর জড়ানো, এখনকার মত নয়। বুঝতে পারতাম না, রাগ হোত। একদিন বলে উঠলাম, 'উঃ দাদা, তোমার লেখা পড়াই যায় না, মনে হচ্ছে যেন একসারি পিঁপড়ে ছেড়ে দিয়েছ খাতার ওপরে।' আর দাদার সে-কি হাসি! রৌদ্রে ঝিলমিল নীলিমার মতই সে হাসির ঔজ্জ্বল্য।

কখনো-কখনো পেন্সিলেও লিখতেন দাদা। আরো অবোধ্য হয়ে উঠত তাঁর হাতের লেখা। কত অনুযোগ করেছি, দাবি করেছি, অন্তত একটু বোঝার মত করে লেখ। দাদা হেসে উঠতেন, উচ্চকিত গম-গম করে বেজে-ওঠা হাসি যেন কতই এক আমোদের বিষয়, এক নির্ভার চপলতা ছোট বোনটির সেই দাবি-

দাওয়ার কথাগুলো। বোঝা যেত না মনোভাবটা তাঁর কি-যে, সেই উচ্চগ্রামে বাঁধা হাস্যরোলের মর্ম ভেদ করে। কিন্তু তখন কে জানত, স্নেহকাতরতা তাঁর এতই বেশি যে, সে-সব আপিল পেশ করারও মূল্য ছিল তাঁর কাছে অনেক। নইলে, আজ ত জানি, উত্তরকালে দাদার হাতের লেখা সুগঠিত হবার কাজে সে-অনুযোগ, সে-দাবি কতখানি কার্যকরী হয়েছিল।

অনেক অনেক প্রভাবেলার স্বপ্নময় বর্ণগুচ্ছের মধ্য থেকে একটি রঙ যেন কেমন আলাদা হয়ে আসছে। নিটোল হয়ে জ্বলে উঠছে সে একটি দিনের স্মৃতি, যখন বহুদিনের বর্ণসমারোহই জড়িয়ে-জড়িয়ে মিশে গিয়ে এক বিবর্ণ অথচ স্পর্শগ্রাহ্য আবহ রচনা করে রয়েছে অতীত স্বপ্নের আতুরতায়। সেদিন আকাশময় সোনালি রঙের ভিজে-ভিজে রোদ গড়িয়ে যাচ্ছে, হালকা হাওয়া দিচ্ছে রেশমের রোমাঞ্চময় স্পর্শের মত। ইজিচেয়ারে বসে দাদা লিখছেন, প্রগাঢ় তন্ময়তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন তিনি। সামনেই কৃষ্ণচূড়া গাছে হাজার রক্তিম পুষ্পস্তবক, লাল আগুনে জ্বলছে ; গাছের তলার সজল মাটিতে অশেষ সবুজ ঘাসের তর্‌তরে প্রাণস্পন্দনের মখ্‌মল, তার ওপর আলো-আঁধারের সচল ছায়া-ছবি, নিপুণ আল্‌পনা। এই ত লিখছিলেন, কখন যেন আনমনা হয়ে গেছেন রৌদ্রছায়ার সেই ছন্দোভঙ্গি দেখে, ঘাসের নিবিড়ে ঘাসফড়িংয়ের নৃত্যপরায়ণতায় অভিনিবিষ্ট হয়ে গিয়ে। একটা বিড়াল কখন থেকে ঘোরাঘুরি করছে, আসছে-যাচ্ছে অন্ধকারের মত নরম পায়ে, লাফালাফি করছে আলোছায়ার চঞ্চলতার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে। ঘাসের বুকে আঁচড় দিচ্ছে, মাটির বুকে, কখনো বা ছুটে গিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছের গায়েই নখের জোর পরীক্ষা করে নিচ্ছে। রোদের সঙ্গে, প্রকৃতির নম্র হৃদয়ের সঙ্গে এই কলহ দেখে কেমন যেন কৌতুক বোধ করছিলেন দাদা, কিংবা ব্যথিতই হয়েছিলেন। কবিতা লিখলেন। এখন 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থটিতে সেই কবিতাটি রয়েছে ;—'বিড়াল'।

এমনি করে আরো অনেক কবিতাই লেখা হয়েছে, অনেক কবিতার জন্মলগ্নের কিছু-কিছু হিশেব এলোমেলো করে জানা আছে হয়ত, কিন্তু কেন জানি না

এই একটি দিনের স্মৃতি আজো শিশিরবিন্দুর মত টলটল করছে মনে। তাঁর শেষদিককার কবিতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেকটা পাঠকের মত হয়ে উঠেছিল, বাধ্য হয়েই, কেননা কার্যব্যপদেশে তাঁর থেকে দূরে থাকতে হয়েছে। কিন্তু দূরে যেতে হলেও, সত্যি-সত্যি আর দূরে যেতে দিচ্ছে কে! যখনই কলকাতায় এসেছি তাঁর কবিতা সম্পর্কে কোন্ কাগজ কি মন্তব্য করল, কোথায় কোন্ কাগজে কোন লেখা বেরোল, সে-সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হও, কোনো বিশিষ্ট ঘটনা যদি ঘটে থাকে ইতিমধ্যে তার সালঙ্কার উষ্ণ ব্যাখ্যান শোনো, এই বই-এর প্রচ্ছদটা কেমন হয়েছে বল্ তো, আমার কিন্তু একেবারেই ভাল লাগে নি, আমি কি রাজকুমারী অমৃতকুমারীকে ভেবে এই সব কবিতা লিখেছিলাম নাকি! বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠতেন যেন বলতে বলতে, সারামুখে যেন ঈষৎ রক্তাভা ছড়িয়ে যেত। কথার মোড় ঘোরাতে বলতে হোত, 'জানো দাদা, নানারকম আচার এনেছি এবার তৈরি করে, কি কি চাও, কুল, আম—।' আচারের প্রসঙ্গটা সবসময়েই লোভনীয়, অশেষ তৃপ্তির। ছেলেমানুষের মত সরল ঔৎসুক্যে ঝলমল করে উঠতেন, বলতেন, 'আমার বাড়িতে ক'দিন এসে থেকে যা না, চাকরটা যা হয়েছে, কিছু যদি ভালো রান্না জানে। ওকে খানিকটা হাতে ধরে রান্নাটা শিখিয়ে দে না, আর দেখ, অমনি জলপাইর আচারটাও করে দিয়ে যাস্।' ভালো রান্নার লোভ ছিল, আচারে ততোধিক। যে ছেলেরা তাঁর শেষের দিনগুলোতে সেবা শুশ্রূষার কাজে আমাদের সাহায্য করার জন্যে হাসপাতালে তাঁর পাশে পাশে রাত কাটিয়েছে, আচারের জন্যে আতুরতা তিনি তাদের কাছেও প্রকাশ করেছেন। তারা যদি বলেছে, এই এত রাতে কোথায় পাব, ভোর হোক, কাল নিশ্চয়ই এনে দেব। তিনি তাতে চটে গেছেন, গম্ভীর মুখে বলেছেন, 'য়্যাম আই ইন্ ক্যালকাটা? দেন্?'

বরিশালে তাঁকে আবাল্য অনেকগুলি বছর কাটাতে হয়েছে, সে-সব তাঁর পুষ্পকোরকের অনাদি বিস্ময়ে, অপার ভালোবাসায় আলোক দেখার দিন। তার পরে কর্মজীবনেও ঘুরে-ফিরে আবার বরিশাল। অধ্যাপনার কাজে।

ইতোমধ্যে অধ্যাপনার চাকরির তাগিদে নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে তাঁকে; বাঙলায়, বাঙলার বাইরে। গাঢ় প্রশান্ত নীলিমার সীমান্তে, রুক্ষ পাটল আকাশের নিচে। নানান্ আবহাওয়ার পরিমণ্ডলে। কিন্তু বরিশালের শ্যামলা হাওয়াতে মাটিতেই যে তাঁর সান্ত্বনা, তৃপ্তি, তাতে আর সন্দেহ কি? যখনই কোনো প্রসঙ্গে বরিশালের কথা উঠেছে, তার প্রশস্তিতে তাঁর যেন আর মুখে কথা ধরেনা। শেষের দিকটাতে অবস্থা এমনিই হয়েছিল যে, ভালো থাকা মানেই বরিশালে যেমন ছিলাম, তেমনি থাকা। কারুর সংসর্গে অতুল আস্বাদ আনন্দ পেয়েছি মানে বরিশালের সেই-সেই দিনগুলোতে যেমনি অনাবিল সারল্য-সার আনন্দে মগ্ন হয়ে থাকতাম সর্বক্ষণ। আসলে বরিশালের সর্বপ্রকৃতিময় ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র উপকরণ গুলোর সঙ্গেও তাঁর যেন এক অদৃশ্য প্রচুর কাছাকাছি জানাশোনা ছিল। যেন সব ছিল আপন, অনুদ্ঘাটনীয় রহস্যের আলো-আঁধারিতে আপন। বরিশালে তাঁর নিজের ঘরটির রূপ চোখে লেগে আছে। ভুলবার নয়। প্রাঙ্গনে কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে মখমলের মত সবুজ ঘাস। তার ওপরে কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম পাপড়ির সুচারু আল্পনা আঁকা। সূর্যের জাফরাণি আলোর রঙে লতাপাতা পাখ-পাখালির সর্বাঙ্গ মুড়ে থাকে। জানালার সামনে দু'টো গন্ধরাজ গাছ আগাগোড়া সাদা ফুলে ছেয়ে গেছে, পাতা দেখা যায়না। পাতার আড়াল থেকে উঁকি দেয় নীলজবা। মাধবীগুচ্ছে রক্তরাগ। কাঁঠালিচাঁপার তীব্র মধুর গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত। একটি কবিচিত্ত ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকে, বিচিত্র রঙের ছোঁয়ায় মনের দিকে দিকে আনন্দের উৎসব পড়ে যায়। একটি বিড়াল বা ক'টি কমলালেবুর হিম করুণ শরীর বা অসময়ে ঝরে যাওয়া ম্লান কচি নষ্ট শশা কিংবা মাঠে পথে ছড়িয়ে থাকা ঝাউপাতা, চোরকাঁটা, লাল তারার মত লাল বটফল—এমনি সব ছোটোখাটো ছবির উপকরণও মনে গাঁথা হয়ে যায়, সৌন্দর্যে ব্যঞ্জনায় অনন্য হয়ে ওঠে; হয় কাব্যের সামগ্রী।

বসন্তের বুকে গৈরিক গ্রীষ্ম কঠোর সন্ন্যাসী দৃপ্ত পায়ে হেঁটে যেতে আসে। যদিও অগ্নিবরণ কৃষ্ণচূড়ার সমারোহ শেষ হয়নি তখনও, বাগানের সবুজ

মেহেদীগাছের বেড়ার কিনারে যদিও আলো ছড়াচ্ছে তখনও একসারি ইটরঙের লিলিফুল, তবু আকাশে যেন তরল আগুন ছড়িয়ে গেছে, বাতাসে অগ্নিকণা। ইস্পাতের মত উজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকিয়ে একটি মুগ্ধ কবিচিত্ত ছটফট করে ওঠে অস্থিরতায়। কি অপূর্ব রুদ্র এই দীপ্তি, কি ভয়াবহ তীব্র দাহ, কি আশ্চর্য দৃঢ় ঔজ্জ্বল্য। মাঝে মাঝে নিতান্ত 'নীলোৎপলপত্রকান্তিভিঃ কচিৎ প্রভিন্নাঞ্জনরাশিসন্নিভৈঃ' মেঘমালা দূর দিগন্ত ভ'রে ফেলে চোখের চাতককে দু'দণ্ড তৃপ্তি দিয়ে যায়। তার পরেই আবার ডাক-পাখির চিৎকার, গাংচিলও শালিকের পাখার ঝটপট, মৌমাছির গুঞ্জরণ--উদাস অলস নিরালা দুপুর। সবুজ বনশ্রী, মাথার ওপর শফেদা মেঘের সারি, বাজ পাখির চক্কর আর কান্না। মনে হচ্ছে যেন মরুভূমির সবজিবাগের ভেতর বসে আছি, দূরে দূরে তাতার দস্যুর হুল্লোড়। আমার তুরাণী প্রিয়াকে কখন যে কোথায় হারিয়ে ফেলেছি।'

আসে ধানের আর শিশিরের মাস হেমন্ত। পাতায় ফুলে ধানের গুচ্ছে আকাশের স্নেহ শিশির হয়ে লেগে থাকে। গাছে গাছে পাতারা হলুদ হয়, ধানে জাগে গেরুয়া রঙ, রদ্দুরের রঙ নিভু-নিভু নরম হয়ে আসে। শিশিরের গন্ধ মেখে অশ্বত্থের জানালায় উঁকি দেয় পাখিরা নীড়ের সন্ধানে। স্বর্ণশস্যের সফলতায়, শিশিরের ক্লান্তিতে, শান্ত প্রকৃতির সব ঐশ্বর্যে নিভন্ত ম্লানতায় এই ঋতুটি বিশিষ্ট হয়ে থেকে যায় তাঁর মনে। সব শুভ্র স্বপ্ন, সব মুগ্ধ স্বপ্ন, স্বপ্নের মত বাস্তবতার শেষে অতুল সম্পন্নতার আতুর ধ্বংসাবশেষের সমারোহের মধ্যে যে স্পর্শকাতর মনটি ব্যথিত হতে থাকে, হেমন্তের নিভে-নিভে যাওয়া রূপের দীনতায় তা যেন বেশি করে ক্লান্ত হোত। ঋতুগুলির মধ্যে হেমন্ত সবচেয়ে রিক্ত, নিঃস্ব, অবহেলিত, যাকে তিনি 'সুররিয়ালিষ্টিক' মন বলেছেন, তা বুঝি এই সব হারাবার হাহাকারে জাগতে শুরু করেছিল, তাই হেমন্তে যতটা তিনি একান্ত তেমনটা যেন আর কিছুতেই নয়।

এমনি পটভূমির আপনতার মধ্যে তাঁর নিজস্ব ঘরখানির চিত্র চোখে ভাসে। কোঠাবাড়ির সাধারণতার মধ্যে তাঁর তৃপ্তি ছিলনা, তাঁর ঘরে তিনি পাকা ছাদ

তৈরী করতে দেননি। তা ছিল খড়ের। তার ঘরের কিঞ্চিৎ গ্রাম্য দীনতা বা বলা যায় হার্দ্য সম্পন্নতা তিনি প্রাণের মত প্রয়োজনীয় বোধ করতেন। গৈরিক গোধূলি আসে, শান্ত সন্ধ্যা, তারা ভাসিয়ে নিবিড় নীল আশ্চর্য রাত্রি গলে গলে যায়। নানা স্থান নানা রঙে মন অসহ্য সুখে টনটন করে ওঠে। সব মিলিয়ে, সবার মধ্যে সেই ঘরখানিকে বাস্তব স্বপ্নের মত মনে হয় যেন। পরম প্রীতিকর মনে তার কুণ্ঠিত আশ্রয়। অজস্র তারায় তারায় একা একা রাত জাগতে থাকে অপার অকূল আশ্বিনের আকাশ, জামিরের বনে মেঘের মত ভারি হাওয়া আলুথালু হয়ে ভেঙ্গে যায়। মন বলে 'গোধূলির মেঘে মেঘ, নক্ষত্রের মত র'ব নক্ষত্রের সাথে।'

পটভূমির পরিবর্তন হয়। অনেক বন্ধুর চড়াই-উৎরাই পার হয়ে হয়ে শেষ পর্যন্ত অধ্যাপকের কাজ নিতে হয়। বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটের একখানা ঘরে দু'ভাই-এর দিন কাটে। একজন অধ্যাপক, আরেকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এস-সি ক্লাশের ছাত্র। দাদা অধ্যাপনা করে টাকা রোজগার করেই খালাস, বাকি সময় লেখায় কাটে, আর সব দায়-দায়িত্ব মেজদার। মেজদার কাটে ষ্টোভে রান্না করায়, ছোট্টো সংসারের নানান্ টুকিটাকি কাজে, তার ফাঁকে ফাঁকে পড়াশুনোয়। দুই ভাইয়ের নিবিড় অন্তরঙ্গতায় দিনগুলো মধুর হয়ে উঠে। কখনো বরিশাল থেকে মা এসে উপস্থিত হন। মার স্নেহে, সহস্থিতিতে দিনগুলো রূপ হয়ে ওঠে; ভাঙা হাটে চাঁদের আলো ঝলমল করে। কিন্তু হঠাৎ সিটি কলেজের কাজ গেল। আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়। হয়ত কারু কারু ভ্রূ কুটিল কুঞ্চিত হোল, কিন্তু বাবা মা! রোষকষায়িত অরুণ নেত্রের পরিবর্তে মা'র চোখে অতল দিঘির মত অপরিসীম স্নেহ ও সান্ত্বনা, বাবা বিক্ষোভহীন শান্ত স্থির।

সেই সময়টা আমরা তাঁর থেকে দূরে ছিলাম। সে সময়ের কথা বলতে পারবোনা। আবার কিছুদিন তিনি যখন বরিশালে আমরা তখন কলকাতায় বা অন্যত্র। মাঝামাঝি অনেকদিন স্থিতিহীন হয়ে ঘুরে বেড়াতে হোল বাগেরহাটে, দিল্লিতে,

কতদিন কাটল কলকাতার প্রেসিডেন্সী বোর্ডিং-এ শুধু ছেলে পড়িয়ে। তারপর আবার ভ্রান্ত দুর্যোগ-উদ্বেল রাতের শেষে প্রসন্ন প্রভাতের মত বরিশাল। বরিশালেই অনেক দুর্গত সময় কাটানের পরে পুনরায় স্থিতিলাভ হোল, সেই বাল্য, কিশোর ও প্রথম যৌবনের উদ্ভাসিত হবার পটপ্রসার। বরিশালের সজল সুনীল আকাশের অজস্র তারকার মত অজস্র কবিতার ফুল।

কিন্তু শান্তি আর স্থিতি সমস্ত জীবন ধরে পেতে চেয়েও পাওনা হোলনা। আবার এলো সেইসব ভীষণতম হিংস্র দুর্দিন। বরিশাল ছাড়তে হোল চিরদিনের জন্যে। মহানগরীর একটা দুর্বার আকর্ষণ ছিল সত্যি, আগেও তিনি কয়েকবার কলকাতায় চলে আসবার জন্যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছিলেন, তবু মনে-মনে তখন এই কথাটি জানা ছিল যে, বরিশালের মাটিতে মমতাময় নিভৃত পরম আশ্রয়-নীড় রয়ে গেছে। শ্রান্ত হলেই সেই নীড়ে ফিরে যাওয়া যায়। কিন্তু বাঙলা ভাগ হয়ে যাওয়ায় ছাড়তে হোল সেই শান্ত নিভৃত নীড় চিরকালের জন্যে।

মহানগরীতে এসে কত বিপর্যয় সংগ্রাম অশান্তিতে কেটেছে দিনরাত্রি। কাজ নেই, স্বস্তি নেই মনে। কিছুদিন খড়্গপুরে, বড়িশায় তারপরে হাওড়া গার্লস কলেজে। এর মাঝে মাঝেও কি অন্য কাজের চেষ্টা হয়নি! খবরের কাগজে কাজ। তবু লিখবার মত অনুকূল পরিবেশে, মনের আকুল বিশ্রামে নিশ্চিন্ত থাকার মত দিন পাওয়া যায়নি কখনো ; কিন্তু তারই মধ্যে কত আশ্চর্য কবিতার না প্রস্ফুটন ঘটেছে। কোন স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায়নি অথচ গেলে ভালো হোত, তা নিয়ে ব্যস্ত হবার মত মনই ছিলনা তাঁর, শান্তিটুকুই ছিল কাম্য। যে সময় পাওয়া গেছে তাতে কোনরকমে মানিয়ে নিয়ে আরো কোনো অনায়াসতায় যাওয়া যায় কিনা তা নিয়ে কিঞ্চিৎ ভাবিত তবু বরং হয়েছেন। তাই যখন কোনো কবি সম্বন্ধে তিনি কাউকে বলতে শুনেছেন 'উনি এই সব হীন অভাব-অভিযোগ, পণ্ডিত জনের প্রতিকূলতার জন্যে আর লিখতে পারছেননা ইদানীং। দাদা আশ্চর্য উদারতায় হেসে উঠেছেন প্রবল প্রচুরতায়, বলেছেন, 'তাহলে

ত বলো, আমাকে অনেক আগেই লেখা বন্ধ করা উচিত ছিল। কই, আমি কি তা করেছি। আনন্দের যে অন্তঃশীলা ফল্গুধারা তাঁর জীবনের নিভৃতির কোল ঘেঁষে নিয়ত বহতা হয়ে ছিল, তাতে ছোটোখাটো বিরূপতা উপেক্ষা করে যাওয়া বোধ করি সম্ভবপর ছিল তাঁর কাছে। ল্যান্সডাউনের বাড়ির বারান্দায় ইজিচেয়ার নিয়ে বসতেন লিখতে, সামনেই ছিল একটা পত্রবহুল নিমগাছ। তার পাতার ঝালরের ফাঁক দিয়ে আলোর জলে ধুয়ে নেওয়া ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন নীল আকাশ চোখে পড়ত। মুগ্ধ বিস্ময়ে, কিছু না লিখে চুপচাপ বসে থেকে, হয়ত মনে মনে অনেক চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে থাকতে দেখেছি তাঁকে। যে কথাটা মোটেই বলার মত কিছু নয়, সেই কথাটাই যে কতবার কত নতুন পরিবেশে তিনি বলেছেন আমাকে। যেন একথাটার কোনো ব্যবহারিক ওজন নেই বলেই অন্য দিকে এক বিপুলবিসার অর্থ রয়ে যায় সর্বক্ষণ, পুরোনো হয়না, বেদনার ধার মরেনা, অনন্ত আনন্দের ব্যথায় বিদীর্ণ হতে অস্থিরতা নেই, কেমনা ক'জনই বা সে খরধার অনুভবের খোঁজ রাখে। বলতেন, 'কি সুন্দর এই গাছ আর আকাশ। জানিস, এই বাঙলা ছেড়ে কোথাও যাবোনা, কোথাও যেতে পারবোনা। এমন আকাশ আর গাছপালা আর কোথায় আছে বল্।' এই বাঙলার ত্রস্ত নীলিমার খণ্ডিত অবসরে ওই বাড়িতে অজস্র বইএর বন্ধুত্বে, মনের একান্ততায় হয়ত ভালোই থাকতেন তিনি, যদি না জনৈকা প্রতিবেশিনীর অজস্র দৌরাত্ম্যে সর্বক্ষণ বাড়ির হাওয়া পরিবেশ পঙ্কিল হয়ে থাকত। সর্বদাই কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে বেঁধে রেখে মহিলাটি বাতাসের ঈথার তরঙ্গকে এমনি ব্যতি-ব্যস্ত করে রাখতেন, যে ক্রুদ্ধ তরঙ্গগুলো তার শোধ তুলত অন্যের কর্ণপটহে। বিশেষ করে দাদার মতো লোক, যিনি যে কোনো মহিলা সংসর্গেই কেমন অসহায় বোধ করতেন নিজেকে, তাঁর অবস্থা যে এই পরিবেশ বৈগুণ্যে অত্যন্ত করুণ হয়ে উঠবে, তা না বললেও চলে। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন সঙ্গিন হয়ে উঠল যে, লেখাই তাঁর প্রায় বন্ধ হবার মতো। এই বাড়িতে থাকা যখন দুরূহ হয়ে উঠল কেবলি বাড়ি খুঁজেছেন তিনি। যে সব ছেলেরা তাঁর কাছে লেখার দাবি

নিয়ে এসেছে, তাদের কাউকে যদি তাঁর মনে হয়েছে যে, সে তাঁকে সত্যি ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, অমনি তাকে বলেছেন একটা মোটামুটি সুন্দর বাড়ি খুঁজে দিতে। ছুটিতে এলে আমাকে নিয়ে কত যে বাড়ি দেখিয়েছেন, তার শেষ নেই। প্রায়শই পছন্দ হয়নি ; এমন বাড়ি খুঁজতেন যেখানে আছে আকাশের অবারিত আলোর প্রবেশ, উজ্জ্বল তৃণতরঙ্গের প্রাঙ্গণ। একটু কাঁচা মাটির সান্ত্বনা থাকা চাই, যেখানে খালি গায়ে বেড়িয়ে বেড়ানো চলবে। শান্তিনিকেতনে একটুকরো জমি রয়েছে মেজদার, সেখানে একটা 'কটেজ' বানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন মেজদা, কিন্তু কলকাতার ধারে কাছেই থাকার জন্যে তাঁর ইচ্ছা ছিল। এবার পূজোর ছুটিতে কেবলি বলেছেন, আমার মধ্যে লিখবার এমন একটা প্রবল প্রবাহ এসেছে যে ভাবছি কলেজের কাজ ছেড়ে দেব, শুধু লিখব, কলকাতার কাছাকাছি কোথাও একটা জমির খোঁজ করনা।' আমি এরকম একখণ্ড জমির খোঁজ নেবার চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু তার আর দরকার হোলনা।

যা গেছে তার জন্যে তাঁর দুঃখ থাকলেও তা নিয়ে অক্ষমের বিলাপ করতে চাননি তিনি, চেয়েছিলেন ভবিষ্যতে নতুন করে তেমন পরিবেশ গড়ে তুলতে। যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বারংবার বিভিন্ন চিঠিপত্রে বলেছেন তিনি, 'বরিশালের দিনগুলির মত ভালো থাকা।' মা চলে গেছেন এর মধ্যে। তাতে দাদার জীবনে একটা অসহায় স্পর্শাতুরতার স্থানে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, সে সম্বন্ধে তিনি উদাসীন থাকতে চাইলেও আমরা সবাই জানতাম কেমন তীক্ষ্ণ করে সে শূন্যতাটা তাঁকে বিঁধছে। তিনি হয়ত তার কিছুটা পরিপূরণ চেয়েছিলেন মেজদাকে দিয়ে, যে মেজদা তাঁর আবাল্যের সহচর, সহোদর অনুজ হয়েও তার অন্তরতম বন্ধু। মেজদা সব সময়ে দাদার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যেমন তাঁর সাংসারিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজনগুলোর দিকে অনেক দুর্ভাবনা থেকে তাঁকে আড়াল করে রেখেছিলেন, তেমন তাঁর অন্যান্য নানান্ সমস্যার সমাধানেও সবসময়ে সচেষ্ট ছিলেন। আর যে দাবিটা তিনি প্রায়শই করে থাকতেন

আমার কাছে, তা আমার পক্ষে মান্য করা সম্ভবপর হয়নি। তার জন্যে অসমর্থের অনুশোচনার অন্ত নেই। বলতেন, 'কলকাতায় চলে আয় তুই, এখানে একটা চাকরি-বাকরি নিয়ে নে। বরিশালের আবহাওয়াটা ফিরে আসুক।' আপাতত তাঁর আমার কাছে লেখা একখানা চিঠি হাতের কাছে রয়েছে। চিঠিটায় তারিখ লেখা রয়েছে, ২.৭.৫৪। লিখেছেন, '……… ……তুমি কয়েকদিন এখানে ছিলে, বেশ বাড়ির atmosphere বোধ করছিলাম,—বিশেষতঃ সেই অনেক আগের বরিশালের মতন। তুমি কোনো একটা কাজ নিয়ে কলকাতায় চ'লে এলে নানাদিক দিয়ে খুব ভালো হত।' এই চিঠিটার উল্লেখের দরকার ছিলনা, যদিও করতে হ'লে অনেকই করা যেতে পারে, কিন্তু করলাম এই জন্যে যে, সাধারণ্যে, মনে হচ্ছে, একটা ধারণা ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে সাহায্য করছে কারো কারো দাদার সম্পর্কে লেখা প্রবন্ধ বা স্মৃতিকথা যা নির্ভেজাল ভুল, যাতে এমনটা বলার চেষ্টা আছে যে দাদার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা তেমন গাঢ় ছিলনা। ছিল কি ছিলনা, সে সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকমহল যে-কোনো ধারণা পোষণ করতে পারেন, তাতে আমাদের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবার কথা নয়, কিন্তু আমার মনে হয়, স্মৃতিকথা বা জীবনীতে যেহেতু কল্পনার চাইতে বাস্তব ঘটনার দাবিটা বেশি, তাই যা সত্য তাই বোধ করি লোকের সামনে তুলে ধরা কর্তব্য। আরেকটা কথা বলতে পারি, দাদাকে তাঁরা সবাই নিশ্চয়ই অত্যন্ত ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই, যাঁরা তাঁর জীবন সম্বন্ধে লিখেছেন, কিন্তু সেই ভালোবাসার আতিশয্যে তাদের বোধহয় অন্য কাউকে অহেতুক কল্পনার সাহায্যেই সবার কাছে অশ্রদ্ধার্হ করে তোলা উচিত হবেনা, অথবা তাঁদের ব্যক্তিত্বের উপযুক্ত হবেনা সেই সব কথা লেখা যা তাঁরা পুরোপুরি সঠিক করে জানেননা। কিন্তু সে থাক্। আসলে আমি ত জানি দাদার কি অসীম স্নেহ ছিল আমাদের জন্যে। দুটো দৃশ্য আজ বিশেষ করে মনে পড়ছে আমার। সেই তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' যেদিন প্রথম বেরোল; সে একদিনের কথা'। তখন আমি ছুটিতে কলকাতায়। আর কেউ তখন পর্যন্ত

জানেনই না যে কয়েকটা কপি বাড়ীতে এসে গেছে। দাদা প্রথম কপিটা আমাকে দিয়ে গভীর আগ্রহ ও ঔৎসুক্য নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রচ্ছদপটটা কেমন হয়েছে বল্ তো ?' যেন আমার মতামতের ওপরেই প্রচ্ছদপটের ভালোমন্দ একান্তভাবে নির্ভর করছে। আর, যেদিন সেই শোচনীয়তম দুর্ঘটনাটা ঘটল, তার আগের দিনের একটি ছবি যা এখনও যেন চোখের ওপর ভাসছে। হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে অসম্ভব চিন্তান্বিতভাবে দাদা এলেন মেজদার বাড়ীতে। সারামুখে রক্তিম আভা ছড়িয়ে গেছে, দ্রুত নিশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে। আমার খোঁজ করেছিলেন, আমি তখন ছিলামনা, দেখা হয়নি। কাউকে আর কিছু না বলেই চলে গেলেন। পরদিন সকাল হতেই দাদার কাছে গিয়ে বললাম, 'কাল এমন হন্তদন্ত হয়ে গিয়ে আবার তখুনি ফিরে এলে কেন ? কি হয়েছে ? কোন কিছু খারাপ সংবাদ নাকি ?' তিনি বললেন, 'রাস্তায় আসতে আসতে কাদের যেন বলতে শুনলাম এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, মনে হোল তোদের ঐ বাড়ীতে। তাই দেখতে গিয়েছিলাম তোরা সবাই ভালো আছিস কিনা। তোরা সবাই ঠিক আছিস দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। কাল রেডিওতে আমার কবিতাপাঠ, তোদের কুশল না জেনে গেলে সেটা স্বস্তির সঙ্গে করা আমার পক্ষে সম্ভব হোতনা।' কার কাছে কি শুনেছেন, তার ঠিক নেই, দাদা উদ্বেগাকুল হয়ে ছুটে এসেছিলেন খবর নিতে। সেই ছবিটা মনে আছে, কিন্তু তখনও কি জানতাম এ্যাকসিডেন্টটা সেই সন্ধ্যায়ই তার জন্যেই অপেক্ষা করছে।

বাইরে থেকে যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁরা তাঁকে গম্ভীর, নির্জন, স্বপ্নলোকবাসী বলেছেন ; বলেছেন সর্বক্ষণ একটা অদৃশ্য দূরত্বের বেষ্টনী তৈরী করে তাঁর নিজের চারিদিকে তিনি সবার থেকে আলাদা হয়ে থাকতেন। কিন্তু কত সময় দেখেছি, স্বপ্নলোক থেকে নেমে এসে হাসি পরিহাসে, কৌতুকে গল্পে কেবলমাত্র আমাদের সঙ্গেই নয়, বাইরেরও যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে যেতে সঙ্কোচ করেনি তাদের সঙ্গে এক হয়ে যেতেন। এত মজার মজার কথা বলতে পারতেন যে, হেসে

ফুটিপাটি হয়ে যেতে হোত। যে মানুষ অত গুরুগাম্ভীর্যের কবিতা লিখতেন, তিনি যে অমন চারিদিক উচ্চকিত করে প্রকম্পিত হাসি হাসতে পারতেন, বা অন্যকেও হাসিয়ে হাসিয়ে ক্লান্ত করে দিতে পারতেন, তা যেন না দেখলে বিশ্বাস করাই যায়না। কখনো কখনো বা তাস খেলার নেশা চাপত। বরিশালে কোন ছুটির সময়ে হয়ত দাদা মেজদা দু'জনেই বাড়ীতে রয়েছেন—আর আছেন দাদাদের কোন বন্ধু। আর যায় কোথায়! তাস খেলতে বসতে হোল, চতুর্থজনের স্থান অগত্যা আমাকেই না পূরণ করে উপায় নেই। দুপুরে খাবার পরে দাদার ঘরে তাসের আড্ডা জমলত সে আড্ডা ভাঙতে রাত এগারোটা। মায়ের তাগিদের আর বিরাম থাকতনা—রাত হচ্ছে, রাত হচ্ছে—কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। দাদাকে খেলা থেকে ওঠায় সাধ্যি কার। বিপক্ষ দল হয়ত একটা 'রাবার' করেছে, তাই তাঁর একটা 'রাবার' না-করা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। একটা হোল ত আরো একটা। আরো একটা।

পরিহাস ও কৌতুকপ্রিয়তা আমার মাতুলবংশের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বোধ হয় লাভ করেছিলেন তিনি। আমার দাদামশায় ৺চন্দ্রনাথ দাশ খাঁটি পূর্ববঙ্গের ভাষায় বহু হাসির গান ও ছড়া রচনা করেছিলেন। দাদা একজায়গায় তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন যে, 'দাদামশায়ের অনেক লেখা ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, হেম, রঙ্গলাল ইত্যাদিকে মনে করিয়ে দিলেও তাঁর সফলতর লেখা—বিশেষ করে কয়েকটি গান—লোকগাঁথা ও লোককবিতার খানিকটা সার্থক উত্তর সাক্ষ্য হিসেবে টিকে থাকবে মনে হয়। পরিহাসপ্রিয়তা দাদার যে শুধু আমাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, চাকরবাকরদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিহাস তাদের হাসিয়ে মারত।

আসলে কৌতুকপ্রিয়তা তাঁর এমনই সাধারণ স্বভাব যে, অনেক বিরূপতাতেও তিনি নিছক কৌতুক উপভোগ করেছেন, আর তার ফলে উপেক্ষা করতে পেরেছেন সহজে। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁকে নিষ্ঠুরতা কম সইতে হয়নি, তাঁর প্রথম দিকের সাহিত্যসাধনার কালে যে সব অতিপণ্ডিত সমালোচকগণ

সমালোচনার নামে, তাঁদের নিজেরই কথায় ধাঙরের কাজ করতে নেমেছিলেন এবং যাঁরা নিজেরাই এখন উল্টো ভূমিকায় পতিত হয়েছেন, তাঁদের সেইসব লেখার উৎসাহী পাঠকও ছিলেন তিনিই, কেননা সেসব প্রলাপে হাসির উপকরণ যথেষ্টই থেকে যেত, তেমন করে নিতে পারলে। তাই গায়ে পড়ে বাদ-প্রতিবাদের প্রয়োজন হয়নি তাঁর। সব কিছুই ভালো ছিল, সব কিছুই প্রাণখোলা হাসির মত সহজ ছিল, অনাবিল ছিল, উপেক্ষার হাসিতে উড়িয়ে দেওয়া চলত সব প্রতিবন্ধকতা। এই সহজ পরিহাসের স্বচ্ছতার জন্যেই রাস্তায় মোটরকারের অভদ্রতার কথা বলতে গেলে লেখা যায় :

> 'একটি মোটরকার গাড়লের মত গেল কেশে
> অস্থির পেট্রল ঝেড়ে ;—'

তবু, গাড়লের মত মোটরকার না হোক, তারই স্বজাতি ট্রামকার অনেক কিছু ভীষণতরো দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। এই 'কার' জাতিটা যে মাত্র নির্বোধ 'গাড়ল'ই নয়, তার চাইতে অনেক অনেক বেশি ক্ষমতাবান, সেইটের প্রমাণ দেবার তাগিদ ছিল হয়ত তাদের। নইলে সব কিছুই ঠিক ঠিক আগের মত থাকবে, শুধু একজন যাঁর আরো অনেকদিন এখানে থাকার কথা ছিল, পৃথিবীকে ভালোবাসার কথা ছিল, কথা ছিল বাংলার ত্রস্তনীলিমার শান্তিতে মগ্ন থাকার, 'সত্য আলো'র বেদনায় দীর্ণ হবার, সেই শুধু রইলনা কেন ? ধানসিড়ি নদীটি তেমনি প্রাণকল্লোলে বয়ে চলবে, সবুজ প্রান্তর মরকতের মত উজ্জ্বল হবে, অর্জুন ঝাউয়ের বনে বাতাস তেমনি করেই বইবে, সোনালি রোদ ডানায় মেখে শঙ্খচিল উড়ে যাবে, গোধূলির রঙ লেগে অশ্বথ বটের পাতা নরম হবে, খয়েরি শালিক খেলবে বাতাবী গাছে, কিন্তু সেই একজন, সেই একটি প্রাণময় সত্তা যে এই বিচিত্র রূপরাজ্যের পথে পথে হারিয়ে হারিয়ে গেছে, 'সত্য আলো'র বিস্ময়ে বেদনায় ভেঙ্গে ভেঙ্গে গেছে তাকেই শুধু খুঁজে নেওয়া যাবেনা এদের মাঝে। এই শিশিরঝরা ধানের গন্ধে ভরা হেমন্ত রাতে—গাছের পাতারা যখন হলুদ

হয়ে এসেছে, জোনাকির আলোয় দূরের মাঠ বন যখন ঝিলমিল, তখন নতুন করে সেই পুরোনো গল্পের পাণ্ডুলিপির আয়োজন চলছে আজ। সেই গল্প। আজ আর আমাদের পূর্বপুরুষরা সে গল্পের নায়ক নন্, নন্ তাঁরা জ্যোৎস্না-মোছা রাতে শিশিরে ধানের দুধে ভিজেভিজে হাওয়ার শরীরে স্বপ্নময় পরীদের হস্তগত। আজ যিনি, তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যাবেনা শিশির ঝলমল সোনার ধানক্ষেতের পাশে ভোরের আলোয়। পৃথিবীর ভালোবাসায় চিরতরে যতি টেনে স্বপ্নের পরীদের হাতে নিঃশেষে তুলে দিলেন নিজেকে, তাঁর শয্যায় কাঁচা লবঙ্গ এলাচ দারুচিনি থাকবেনা ছড়ানো, থাকবে তাঁর কাব্যে দূরতর সায়াহ্নের সমীপবর্তী সবুজার্দ্র দ্বীপের দারুচিনি লবঙ্গ এলাচের বনের রহস্যময় ধূসর ইসারা। নিজে তিনি নিদ্রার নির্জনে চিরপ্রিয় স্বপ্নের বলয়ে নিমগ্ন হয়ে থাকবেন—হয়তো ঃ

চাহিয়াছে অন্তর যে ভাষা
যেই ইচ্ছা যেই ভালোবাসা
খুঁজিয়াছে পৃথিবীর পারে পারে গিয়া
স্বপ্নে তাহা সত্য হয়ে উঠেছে ফলিয়া,—

মহত্তম কবি জীবনানন্দ দাশ

নীহাররঞ্জন রায়

নতুন পরিণতির সম্ভাবনামুখে কবি জীবনানন্দ দাশের শোকাবহ অকাল-মৃত্যুতে আমাদের যে-দুঃখ, যে-আক্ষেপ, তার সান্ত্বনা খুঁজে পাবো কোথায়? বাংলা দেশে রবীন্দ্রোত্তর সাম্প্রতিক কাব্যের যে-কাল চলছে সেখানে ব্যাপক বিশাল জীবনাভিজ্ঞতা ও গভীর মহৎ ভাবে ভাবিত ও শিক্ষিত, গম্ভীর ধ্যানে সমাহিত কাব্য খুব বেশি নেই। স্বল্প অভিজ্ঞতায় সৎভাবে শিক্ষিত, কারুসমৃদ্ধ কবিতা আছে অনেক, ব্যাপকতর অভিজ্ঞতায় বিশৃঙ্খল কবিতাও রয়েছে বহু। কিন্তু,

> 'চরিতার্থ দেহমিলনের ফলে একটি মাত্র বিদেহ স্পষ্টতার প্রকাশ যে-কবিতায় যেখানে কবিতা জ্ঞানে গভীর নয় শুধু, অথবা প্রাকৃত জীবনের ব্যাপার নিয়ে নিবিড় নয় কেবলমাত্র—এই দুই জিনিস মিলে এক হ'য়ে গেছে যেখানে এমনই আত্মিক নিবিড়তায় ও গাণিতিক শুদ্ধতায় যে সহসা মনে হয় মিলনোৎপন্ন কবিতা জ্ঞান নয় আর, জীবনও নয় যেন, জীবনের সঙ্গে সমান্তরাল জিনিস, কিংবা জীবনকে কোনো আলাদা জগতে নিয়ে গিয়ে নতুন করে সৃষ্টি'...

তেমন কবিতা ক'টি আছে সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে? এ-প্রশ্ন জীবনানন্দ নিজেই একদিন উত্থাপন করেছিলেন। সাম্প্রতিক বাংলা কাব্য এবং বাংলা ছোট গল্প নিয়ে আমার গর্ববোধ আছে; এ-কাব্য (এবং ছোটো গল্পও) সমসাময়িক ইংরাজি ও ফরাসী কাব্যের পাশাপাশি আসন দাবি করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। যে স্বল্পসংখ্যক কবির কবিকর্ম নিয়ে আমার এই গর্ব, সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যের গর্ব, জীবনানন্দ তার অন্যতম, এবং সম্ভবত মহত্তম।

'জীবনকে আলাদা জগতে নিয়ে নতুন করে সৃষ্টি'র সাধনায় সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে তিনি অগ্রচারী। 'আলাদা জগৎ' কথাটিতে দূরত্বের ইঙ্গিত

আছে, হয়তোবা অস্পষ্ট ধূসরতার সংকেতও। শুনেই মনে হয়, সে-জগৎ জীবনের কাছাকাছি নয় বুঝি, নির্জন নিঃসঙ্গতায় লালিত সে বুঝি অন্য স্বতন্ত্র এক পৃথিবী। পথক্লান্ত ধূলিবিজড়িত মন সেখানে হেমন্তের প্রান্তরে শুধু বুঝি নক্ষত্রের ফুল কুড়ায়, নিঃশব্দ স্বপ্নচারণায় শিশিরের আঙুল বুলিয়ে কেবলই বুঝি হৃদয়ের অন্বেষণকে ঘুম পাড়ায়। জীবনানন্দের প্রথম দিককার কবিতা পড়ে আমার এই ধরণের কথাই মনে হোতো। পরে আর তা' হয়নি'। 'আলাদা জগৎ' বলতে গিয়ে জীবনানন্দ নিজে বলেছেন, 'জীবনের যত কাছে কবিতা ও তার সংজ্ঞাকে নিয়ে আসতে পারা যায় তত তাকে শিল্পপ্রসাদে শুদ্ধ করা সম্ভব।'

এই শুদ্ধতার আবেগেই হয়তো, অতীত আর প্রকৃতির আত্মীয়তার প্রথম দিকে যতটুকু ব্যক্তিগত ছিল তাঁর হৃদয়ধর্ম, শেষ পর্যায়ে সেই খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ বোধকে অতিক্রম করে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন আবহমান ইতিহাসের ব্যাপ্তিতে ও বিশালতায়। এই বিশালতায় হৃদয়ের নিগূঢ় বাস্তবকে নতুন করে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন—সেই বিশাল গভীরতাকে স্থান দিয়ে মাপা যায় না, কাল দিয়ে ছোঁয়া যায় না। ভূগোলের সব স্থান, ইতিহাসের সব কাল পেরিয়েও যেন হৃদয়ের কোনো সত্য থাকে—অতীত আর বর্তমানে যার ক্ষণিক আভাসই শুধু মেলে, খণ্ডিত স্থান এবং কালে যার সমগ্রতাকে কিছুতেই উন্মোচিত করে পাওয়া যায় না। সে হয়তো উন্মোচিত, উদ্ভাসিত হ'বে কোনো আগামী কালে, কোনো ভবিষ্যত-সম্ভব ইতিহাসে। কাব্যের এই পর্যায়ে যখন তিনি পৌঁছেছিলেন তখন তিনি আর নির্জন, নিঃসঙ্গ নন। তখন ইতিহাস তাঁর সঙ্গী, তিনি ইতিহাসের অঙ্গ। ইতিহাসের দিগদর্শনেই এক নতুন প্রত্যয় ও গভীর জীবন-বিশ্বাসের অধিকারী হ'য়েছিলেন তিনি।

হ'তে পারে আজ দেশে দেশে মানুষ আহত, আর্ত, অন্ধকারে আত্মসমর্পিত। কিন্তু, আগামী-সম্ভব ইতিহাস কি 'বিনিপাতে'ই নিঃশেষিত, 'অমিত শোণিত নিঃসরণের' সরণিতেই সমাপ্ত? মানবিক হৃদয় কি অতীতকে পেছনে ফেলে,

বর্তমানকে অতিক্রম করে নদীর মতই যাত্রা করেনি' হৃদয়ের সাগরসঙ্গমে? সেই কালজয়ী মানবিক হৃদয়কে বিশেষ 'বনলতা সেন'-এর মধ্যে আবিষ্কার করেই জীবনানন্দ সন্তুষ্ট থাকেননি' তাকে প্রসারিত করে দিয়েছেন নির্বিশেষ মানবমানবীর মধ্যে। তাই, যাবার আগে তিনি নতুন প্রত্যয়ের অঙ্গীকার আমাদের শুনিয়ে দিয়ে গেছেন :

এ বেদ ছেড়ে ভালো জীবনবেদ-—অন্য আলোর স্পন্দনে
চলে যাবার অপার সেতু আছে মানবমনে।

তাঁর সুরে লেগেছিল 'তিমির হননের গান' :

নব নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় করে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হ'য়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন
হবে না কি মানুষকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট বসন্তের তরে।
সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয়;
জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।

ইতিহাসের আবহমানতায়, হাজার বছর পথ-হাঁটা অযুত হৃদয়ের পরিক্রমায় জীবনানন্দের অনুভূতিতে এমন একটা সমগ্রতার স্বাদ এসেছিল, যা' ব্যক্তিতেই আবদ্ধ থাকেনি শুধু, প্রেমেই প্রীত হয়নি কেবলমাত্র, ইতিহাসে প্রতিফলিত এবং সমাজ-সভ্যতায় সমাহিত হ'য়ে যা নতুন সার্থকতা, 'অন্য অর্থময়'তার সন্ধান করেছে।

সময়হীনতায় উত্তীর্ণ হবার সাধনা সময়েরই রূঢ় স্পর্শে হঠাৎ স্তব্ধ হ'বে, এ হয়তো প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাস। ইতিহাসের আবহমানতা এ-পরিহাসে ক্ষুণ্ণ হ'বে না; শুধু হৃদয়সঙ্গমের তীর্থযাত্রী বাংলা সাহিত্য একটি গভীর বিশাল অথচ ভীরু সলজ্জ হৃদয়ের গভীর মমতামাখা স্পর্শ থেকে অকালে বঞ্চিত হ'লো!

জীবনানন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত পরিচয়ে কৃতার্থ হ'বার সুযোগ আমার

ঘটেছিল। তাঁর গভীর মনন ও বিস্তারিত কল্পনার স্পর্শ কিছু কিছু আমি পেয়েছি ; এই মনন ও কল্পনাই তাঁকে সাংসারিক দুঃখ-দুর্গতিকে তুচ্ছ করে নিজকে ঊর্ধ্বলোকে প্রতিষ্ঠিত রাখবার শক্তি দান করেছিল। বাংলার সাম্প্রতিক কবিকুলে তাঁর কিছু প্রতিষ্ঠালাভ ঘটেছিল, স্বল্পপরিসর পাঠক-সমাজের ভালবাসাও তিনি কিছু পেয়ে গেছেন। হয়তো এইটুকুই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা। অকালমৃত্যুর পর তাঁর মহৎ, সুকোমল প্রতিভা যদি বিস্তৃততর স্বীকৃতি লাভ করে, তিনি সার্থক হ'বেন, আমরা সার্থকতর হ'বো।

১

I have felt the breath of autumn wind,
With the fragrance of spring still in my heart ;
I have touched, shiveringly, the skirt
Of Autumn—her treasures nervously gleaned ;
She laughed not like summer, nor grinned
Like the wind-weary phantom-girt ;
Nights that out of winter dart
To her own winning sadness she is pinned.

With a flower, or two—a vanishing scent,
A flash of smile on her demure face,
She walks with a light half-spent
By life and half in death's embrace ;
She looks like a lady that is gracefully bent
To track the lost lover's fading trace.

॥ কীটদষ্ট খাতা থেকে এই কবিতাটি উদ্ধার করা হয়েছে, কবিতাটি পেয়েছি আমরা শ্রীযুক্ত অশোকানন্দ দাশের কাছ থেকে। কোনোক্রমেই এ-কথা মনে করবার নয় যে, কবিতাটি হালের লেখা ; প্রথম যৌবনের রচনা এই কবিতাটির রচনাকাল চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর অতীতে তো হবেই। এই কথাটি মনে রেখে কবিতাটি

২

সময় মুছিয়া ফেলে সব এসে

সময়ের হাত

সৌন্দর্য্যেরে করে না আঘাত

মানুষের মনে

যে সৌন্দর্য্য জন্ম লয়—শুকনো পাতার মত ঝরে নাক' বনে

ঝরে নাক' বনে

নক্ষত্রও নিবে[১] যায়—মুছে যায় পৃথিবীর পুরাতন পথ

শেষ হয়—কমলার ফুল, বন, বনের পর্ব্বত

মানুষের মনে

যে সৌন্দর্য্য জন্ম লয় শুকনো পাতার মত ঝরে নাক' বনে

ঝরে নাক' বনে।

[১]মুছে

সতেরো-আঠারো বছর আগের লেখা ॥

পড়তে হবে, কেননা পরিণত জীবনানন্দকে মননে রেখে কবিতাটি গ্রহণ করতে চাইলে নিজের দিকে অসুবিধে এবং কবির দিকে অবিচার ঘটার সম্ভাবনা থেকে যাবে। প্রিয় কবির সাহিত্যসাধনার শৈশব সম্পর্কে স্বভাবতই যে কৌতুকোদ্দীপক কৌতূহল থেকে যায়, সে-দিক থেকে কবিতাটির বিশিষ্ট মূল্য কবির অনুরাগীদের

৩

ঐখানে সারাদিন উঁচু ঝাউবন খেলা করে
হলদে সবুজ নীল রং তার বুকে :
পাখি মেঘ রৌদ্রের ;
তবু আজো হৃদয়ের গভীর অসুখে

মানবেরা প'ড়ে আছে কেন।
আজ অন্ধ শতাব্দীর শতচ্ছিদ্রতার
ভিতরে আলোর খোঁজে যদি চ'লে যায়
তবুও শাশ্বত হ'য়ে থাকে অন্ধকার।

নতুন যুগের জন্য তবুও প্রয়াণ করা ভালো।
চিতল হরিণ ঐ শিং তুলে ফিকে জ্যোৎস্নায়
হরিণীকে খুঁজে তবু পাবে না কখনও ;
ব্যাঘ্র যুগে শুধু মৃত হরিণীর মাংস পাওয়া যায়

। সাম্প্রতিক কালের রচনা ।

কাছে থাকবে যেমন, তেমনি এ-ও হয়তো দেখা যাবে যে, আধুনিক কাব্যধারায় যে-সব প্রসাদ-স্বাতন্ত্র্যে তিনি একান্তই অনন্য, তার পূর্বাভাস যতোটা সুরেখ স্পষ্টতায় এ-সব ইংরেজি কবিতায় ততোটা যেন নয় প্রাক্-'ধূসর পাণ্ডুলিপি' সে-যুগের কিছু-কিছু কবিতায় অন্তত। সঃ মঃ॥

সুচেতনা

জীবনানন্দ দাশ

সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে ;
সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।
এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য ; তবু শেষ সত্য নয়।
কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে ;
তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।

আজকে অনেক রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ
পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মত
ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু,
দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত
ভাই বোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে ;
পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন ;
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।

অনুবাদ

Like an island far as the star of evening
Are you, Suchetana,
Where in the heart of forests of cinnamon trees
There is peace.

The world's blood and toil and glory
Are true ; yet the last truth they are not.
Let Calcutta be the pride of heaven some day ;
Yet shall my heart be yours.

I have striven, worn my feet roving
Seeking to give man what belongs to him
And I am weary roving in the burning sun of day,
Yet so striving to love man,
I see man, my own flesh and blood
Strewn around dead, killed by my own hand.
The world is sick, and in pain,
Yet we are its debtors, and shall remain.

কেবলি জাহাজ এসে আমাদের বন্দরের রোদে
দেখেছি ফসল নিয়ে উপনীত হয় ;
সেই শস্য অগণন মানুষের শব,
শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়
আমাদের পিতা বুদ্ধ কনফুশিয়সের মতো আমাদেরো প্রাণ
মূক করে রাখে ; তবু চারিদিকে রক্তক্লান্ত কাজের আহ্বান

সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে ;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ ;
এ বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল ;—
প্রায় তত দূর ভালো মানব-সমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গড়ে দেব, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।

মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না এলেই ভালো হত অনুভব করে ;

I have seen the ships anchor in harbours
In the burning sun laden with the crop of death
Carcasses heaped of innummerable beings,
The wonder of dead flesh
Beaten into gold, silences us
As it did Buddha and Confucius.
Yet ceaselessly the gory world sounds its call
And beckens us all.

This is the right road to life, Suchetana,
The road of deliverance,
But after many centuries
And many labours of the great
How bracing this sun-warmed breeze ;
Life as good as this we shall build
Without weary, tireless hands,
But not yet that day will come
The good earth called to be born
In human home, and I,
Knowing I should not, yet came.

এসে যে গভীরতর লাভ হল সে সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে ;
দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয়—
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।

॥ স্বাভাবিক ভাবেই হয়তো প্রশ্ন উঠবে একটা : জীবনানন্দের মূল লেখা পড়ার সৌভাগ্যই যখন আমাদের আয়ত্তে, তখন আবার তাঁর কবিতার ইংরেজি অনুবাদ কোনো বাংলা কবিতার পত্রিকায় প্রকাশিত করা কেন। ঠিক এদিক থেকে ব্যাপারটাকে না-দেখে অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্ভর করে বর্তমান অনুবাদটি সংগ্রহ করতে উৎসাহিত হয়েছি আমরা। এ-কথা হয়তো অনেকেরই জ্ঞাত যে, স্মরণীয়

The meaning of this I know now ;
For with the tip of my finger
I have touched the stuff
Of the dew on the leaf at dawn.
What I saw is what will happen
And what will happen
Is what seems not destined to happen
In the timeless dark the eternal sunrise.

অনুবাদ : চিদানন্দ দাশগুপ্ত

আধুনিক বাংলা কবিতার কিছু-কিছু ইংরেজি অনুবাদ, বিলেতে বা আমেরিকায়, সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত হয়েছে ; বিশ্বসাহিত্যের সার্থক সব কবিতার পাশে আধুনিক বাংলা কবিতার, একটা গণ্য অংশ অন্তত, সমমর্যাদার গৌরবান্বিত আসন দাবি করতে পারে, এ-সব কথা, নিজেদের দেশের কাগজে বা বক্তৃতায় ঘন-ঘন সদর্প উল্লেখের চাইতে, প্রমাণ করার চেষ্টা করা আদর্শ কার্য বলে বিদেশী

ভাষায় কিছু-কিছু অনুবাদ প্রকাশ করাও অন্তত অসামান্য প্রশংসনীয় কর্তব্য। কিন্তু বাংলা আধুনিক কবিতা বলতে জীবনানন্দকে যতোটা বেশি নিশ্চিন্ত সার্থকতার এলেকা সসম্মানে ছেড়ে দিতে হবে, তার উপযোগী অনুবাদের প্রচেষ্টা তাঁর বেলায় ঘটে নি প্রায় বলতে হবে, হয়তো তাঁর নিজের অনুদ্যোগের জন্যেই ; তবু তাঁকে বাদ দিয়ে বিদেশের কাছে নিশ্চয়ই কবিতায় নবতর সফলতার মুখের রূপ তুলে ধরা যায় না। জীবনানন্দের কবিতা এতোই একান্ত নিজস্বতায় স্বতন্ত্র যে, তাঁর কবিতার নাকি সৎ অনুবাদ করা যায় না, যেমন অনেকাংশেই কুয়াশাচ্ছন্ন নাকি তিনি, এ-রকম তর্কের কথা শুনেছি। কথাটা যে সত্যি নয় পুরোপুরি, সত্যি যতোটুকু তা যে-কোনো অনুবাদের বেলায়ই প্রযোজ্য যে, তা জানা ভালো। জীবনানন্দের কবিতাও যে রসবত্তা বহুলাংশে বজায় রেখে ও সৎ থেকে মূল রচনার প্রতি, অনুবাদ করা যেতে পারে, তার একটা উদাহরণ হয়তো এই কবিতাটি। অনুবাদ করেছেন শ্রীযুক্ত চিদানন্দ দাশগুপ্ত, ইংরেজি থেকে বাংলায় যেমন, তেমনি বাংলা থেকে ইংরেজিতেও, তাঁর নানা অনুবাদ পাঠক-সমাজে ঔৎসুক্যের সঞ্চার করেছে, প্রবন্ধ-সাহিত্যের অন্যান্য দিকেও তাঁর সাফল্য সম্বন্ধে আমরা সচেতন আছি হয়তো। স্টিফেন স্পেণ্ডরের 'এনকাউণ্টর' পত্রিকায় জীবনানন্দের করিতার অনুবাদ প্রকাশ করেছেন তিনি, পশ্চিমি পাঠক-মহলে যথেষ্ট আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছে তাতে ; তাঁর করা জীবনানন্দের কবিতার আরো অনেক অনুবাদ· হয়তো পশ্চিমি সব কাগজে প্রকাশিত হবে ক্রমশ। নবতর বাংলা কবিতার সম্পূর্ণ পরিচয় যখন জীবনানন্দের কবিতার অনুবাদ ছাড়া অন্যান্য কবিদের স্বপ্রচেষ্ট কিছু-কিছু অনুবাদে বিদেশের কাছে তুলে ধরা যায় না, তখন শ্রীযুক্ত চিদানন্দ দাশগুপ্তের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করবে সবাই। এই আশ্চর্য সুখাবহ সংবাদটি গোচরে আনা, এবং তাঁর সফল অনুবাদের প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ এনে দেওয়ার জন্যেই অনুবাদটি সাগ্রহে সংগ্রহ করেছি আমরা। সঃ মঃ ॥

আর্ত

শ্রীমৃণালকান্তি

নিশার নীরব ঘণ্টা প্রহরে প্রহরে বাজে।
দুঃখের এ কণ্টক শয্যায় ঘুম আসে না যে,
একা একা রাত্রি জাগি।
অনুক্ষণ কী যে চাই,
আকাঙ্ক্ষার দুঃসহ অনলে নিজেরে পোড়াই।
সৃষ্টির বিশাল বৃক্ষে ফোটে কত মাধুর্য-মন্দার !
কত স্বপ্ন, কত গান। হে সময়, কবিতার
নির্জন শান্তির দেশ আর—আর্ত পিপাসায়,
আমি শুধু মুছে যাবো,
দয়াহীন অন্তিম অমায়

কবির নামে

অমল দত্ত

সুদর্শন চক্রচ্যুত হয়ে অদর্শন হলো মধ্যরাতে নগরীর আশা,
যাদব মাধব সর্বকালে যতিভঙ্গ অমৃতের দিয়ে যায় ভাষা,
যার মৃত্যুরতি কত কালপতি বহে পক্ষপুটে—
সমুদ্রের স্বপ্ন মিশে থাকে গুল-আঙুর-বাদাম আর ডালিমে আখরুটে,
ধূ ধূ মরুভূমি শুনে যায় দূর বেলাভূমি গান,
বিষণ্ণ নাবিক এক করে গেছে কর্মফল দান।

শুধু চক্রমন কালনেমিক্রমে বিমনা বিভ্রমে দেশান্তরে,
মননশিলায় কি বা মনের জঙ্গমে ঘরে পরে!
তবু কি গতির গতি আছে?
আপন সৃষ্টিরা পথে বজ্র হয়ে নাচে—
দু'পদ চোখের টানে অতিক্রান্ত হতে
আক্রান্ত জগতে।

কবিস্বপ্ন খোঁজে যোগ্য ভূমি:
হরেক হরফ মাঝে গুরু গুরু মৃত্যুর মৌসুমী
কবির হৃদয়-পলি পিপাসার্ত রাখে।—যত তুমি
আপন খেয়ালে হান প্রত্যন্ত সীমার 'পরে কবির কৌতুক—
কলমে দিয়েছে মিলে স্বপ্ন আর চোখ।
স্বপ্ন কি মাগিতে পারে চোখের বিলয়?
একমাত্র কবিপরিচয়
অতি দম্ভ ভরে তার খ্যাতির ভাণ্ডার লুটে নিয়ে
জীবনানন্দের খেলাঘরে রয়ে যায় সেই গরবিনী প্রিয়ে।

উজ্জ্বল মনের পাখি

(জীবনানন্দ স্মরণে)

শিপ্রা মুখোপাধ্যায়

একটি উজ্জ্বল মন এক রাশ আলো ;
একটি নিমগ্ন মন এক ঝাঁক তারা ;
প্রশান্ত প্রজ্ঞায় তার সারাদেহ কালো
অন্ধকার মেখে নিতে এক আকাশ রাতে
সহসা ধ্যানস্থ রোদে আলোকের ধারা ;—
আদিগন্ত হাহাকার কত নিঃস্ব করতলে কত উধ্বর্ হাতে ॥

মিটি-মিটি মন এক পাখির মতন ;
একটি বিষণ্ণ পাখি পাড়ি দেয় রাতে
বিক্ষুব্ধ আকাশে রূঢ় ঝড়ের মাতন ;—
কেমন উদগ্র চোখ এক রাশ আলো ;
কি প্রসন্ন জিজ্ঞাসা যে অন্ত্যসত্য হাতে
ঝড়ের হৃদয় ছিঁড়ে পাখার বিক্ষীণ বেগে সীমান্তে দেখালো ॥

সেই-সে উজ্জ্বল মন পাখির মতন ;
পাখিটির দেহ লক্ষ তারার আধার ;
অজস্র তারার তীর করেছে হনন
অন্ধকার হতাশ্বাস এক আকাশ কালো—
আকাশে সময় স্থিত, সময়ও অপার—
নিমগ্ন মনের পাখি ঘুমাতেও নিঃস্ব হাতে জ্বেলে রাখে আলো

জীবনানন্দ দাশ

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌

শিশির-সজল ভোরে পৃথিবীর স্নিগ্ধ আঙ্গিনায়
যে প্রথম খুলেছিল চোখ
সে এক আলোর শিশু, ঘাসে ঘাসে, হলুদ পাতায়
সে খুঁজেছে অপার কৌতুক !

শিশুর-বিস্ময় তা'র বয়সের সীমা পার হয়ে
ছিল তবু সহজ, সরল,
হেমন্তে দেখেছে তাই, চোখ খুলে, অনন্ত বিস্ময়ে
এক ফোঁটা শিশিরের জল !

বালুর আড়ালে নদী স্ফীত হয় শব্দহীন গানে ;
পাখা নেড়ে উড়ে যায় চিল ;
একটি কৌতুকী-চোখ দীপ্ত হয়ে তারি আহ্বানে—
দেখে এই অসীম নিখিল !

তবু তার শেষ নেই—প্রকৃতির সব আয়োজন
রূপসী নারীর মতো হেসে—
তা'র চোখে চোখ রেখে, মানবীর মুখের মতন
কতোবার গেলো ভালোবেসে !

হয়তো জীবন তা'র পদ্ম-পত্রে এক বিন্দু জল
তবু তার আছে বহু দাম,
কেননা, রয়েছে আজো জীবনের মতো অবিকল—
সোনালি জলের লেখা নাম।

হাজার বছরের তারা

(জীবনানন্দ দাশ-কে স্মরণ ক'রে)

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

হাজার বছরের মৃত, শীতল, বিবর্ণ তারাদের চোখ
আরো একবার জ্বলে উঠলো, যেমন প্রাণের শিখা জ্বলে ওঠে
আষাঢ়ের মেঘ-ডাকা রাতে স্তিমিত, নিষ্প্রভ নদীর বুকে।
আশ্চর্য ঝড়ের মতো কাল রাতে শতাব্দীর ঘুমন্ত পরীদের ডানায়
এসেছিলো প্রাণের আলোড়ন।

তারপর নিভে গেলো : উৎসবের শেষে সব ঝাড়বাতি
যেমন নিভে যায়, থেমে গেলো সব এস্রাজের টুংটাং
পেয়ালা-পিরিচের শব্দ ; তখন সমুদ্রের মতো প্রশান্তি
আকাশের মতো নির্জনতা।
বিশাল হলঘরটা এখন মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ।

বেগনি, নীল, গোলাবী পর্দাগুলোর রঙ বিবর্ণ অন্ধকারের কাছে পরাজিত
দুরন্ত হাওয়ায় তারা উড়ছে : আমি তাকালাম...
এক রাশ নক্ষত্র প্রাণের প্রতিভা নিয়ে উড়ে এলো ধূ-ধূ নির্জন আকাশে।

হাজার বছরের মৃত, শীতল, বিবর্ণ তারাদের চোখে
প্রাণের বিদ্যুৎ খেলে গেলো...
(এই সব তারাদের কি শৈশব ছিলো না ? দুরন্ত নদীর মতো
ফেনিল, উচ্ছল—এক শিলা থেকে আরেক শিলায়
লাফিয়ে পড়ার দিন ?

ছিলো না যৌবন ?   যেখানে নারীর প্রেম
ঘাসের সবুজ, পাখির চোখ সব কিছু একাকার…।)
'অনেক কমলা রঙের রোদ ছিলো'
জাফরানী সকাল ছিলো, ছিলো ধুলোয় ধূসর রাঙা মাটির গোধূলি
পাহাড়তলীর মাদলের শব্দ-কাঁপা ঝাউবনের নৃত্য,…
হাজার বছরের অভিজ্ঞ, প্রাচীন তারারা ভুলেছিলো সেই অভিজ্ঞান,
ভুলেছিলো : 'সব পাখি ঘরে ফেরে'
সব মাঠের সবুজ রাত্রি হয়, সব নারী প্রেয়সী হয়,
সব সূর্য বাঁশঝাড় পেরিয়ে, পেরিয়ে দিনের পরিচিত সীমানা
বিবুধ রাত্রির নীড়ে আশ্রয় খোঁজে,
সব ম্যমি উঠে আসে অসহ্য ক্লান্তিতে ক্ষোভে মৃত্যুর শীতল নির্মোক ছিঁড়ে,
তারা ভুলে ছিলো · ।

তবুতো দুরন্ত সামুদ্রিক বাতাসে ছিঁড়ে গেলো জানালার পর্দা,
নিভে গেলো ঝাড়বাতি…
বিশাল হলঘরটা কারুকার্যখচিত খিলানের দিকে চেয়ে রইলো
হাজার হাজার আদিম চোখ মেলে।   আমি তাকালাম :
এক এক ক'রে হাজার বছরের মৃত তারারা জাগছে,
জাগছে কালপুরুষ, রোহিণী, পুলস্ত্য, পুলহ, অত্রি, জোহ্‌রা,
আমি দেখছি : প্রতিভার মতো উজ্জ্বল, প্রাণের মতো ব্যাপ্ত
জিজ্ঞাসা জ্বলে উঠছে সেই সব তারাদের চোখে।

হাজার বছরের ঘুম, হাজার বছরের মৃত্যু পার হয়ে
এই তারাদের চোখ এখন আলো ছড়াবে॥

সফেন-শিশির

দীপনারায়ণ দত্ত

সকালের অভ্রস্থূর্য রঙ্ ঢালে পলাশের বনে।
উতরোল কৃষ্ণচূড়া খেলা করে চাঁদের প্লাবনে
আবীর ছড়ানো রঙ মেখে নিয়ে ফাল্গুনের মাসে।
বুনো হাঁস উড়ে যায়—
তোমার স্মৃতির গন্ধ নিয়ে ফের আসে।
গাঙ্চিল ডানা ঝাড়ে,
শব্দ শুনে চেয়ে দেখি, বার্তা শুনি তার—
'এ পৃথিবী একবার পেয়েছিল তাকে, পাবে নাকো আর',
চিল কেঁদে উড়ে যায়—
শূন্যে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে বারে বারে,
নীরব কান্নার ব্যথা ঘিরে আছে
আজ সেই ধানসিড়ি নদীটির ধারে।
আজো দেখি মাঠে মাঠে
পউষের থম্থমে শীতের দুপুরে,
মধুর শিঞ্জিনী তুলে
আম-নিম-হিজলের পাতার নূপুরে
প্রজাপতি-শিশু আর বাতাসের মেয়ে খেলা করে—
তাদের খেলার মাঝে
তোমার স্মৃতির গন্ধ মনে হয় ফুল হ'য়ে ঝরে।
ক্লান্তপক্ষ হংসদূত ভিড় করে আকাশের হ্রদে,
যখন বিজুলী-মেয়ে খোঁপা খুলে আন্মনা শ্যামল জলদে।

হাসির প্লাবন এনে আষাঢ়ের হীরেছোঁয়া জলরেণু মাখে,
তখনো তোমার স্মৃতি ফুল হ'য়ে ফুটে ওঠে পলাশের শাখে।
স্মৃতির আকাশ থেকে
অশ্রুসিক্ত শোকার্ত হৃদয় যখন
মনের মাটিতে পড়ে ডানাভাঙা শরবিদ্ধ পাখির মতন
ভয়াবহ বেদনার ব্যাধ থেকে মুক্তি পেতে চায়,
তখন তোমার নাম
সান্ত্বনার অমৃতের স্পর্শ দিয়ে যায়।
সূর্যের ফাগুয়া রঙ্ নিভে যায় অবসন্ন বিকেলের পরে।
স্মরণের মালা হাতে বীতশোক হৃদয়ের অন্ধকার-ঘরে
সমুখে দাঁড়ায় এসে
শিউলির বুকে নিয়ে বেদনার্দ্র শিশির সফেন—
অরুণিমা সান্ন্যাল শেফালিকা বোস আর বনলতা সেন।

তোমাকে

(জীবনানন্দ স্মরণে)

অবিনাশ রায়

তুমি তো গিয়েছ ফিরে আকাশের ঘরে
প্রবাস জীবন শেষ মৃত্যুর শিয়রে
সঁপে দিয়ে। লিখে দিতে উৎসুক আপনার নাম
হাজার বছর পথ হাঁটিয়াছ। শুধু ভালোবাসার প্রণাম
থেকে যায় শ্রাবস্তীর কারুকার্যময়—
তোমার শান্তির ছবি এঁকে গেছে দুরন্ত সময়
পৃথিবীর পথে পথে—বহুদূর মালয় সাগরে।

তুমি তো গিয়েছ ফিরে আকাশের ঘরে।

মনেতে আক্ষেপ আঁকি। কবিতার দিন
উজ্জ্বল স্বর্গ-চক্র ছিঁড়ে নিয়ে হলো কি বিলীন।
তোমার আকাশে আলো গ্রহ-চাঁদ-তারা—
তবুও ছায়ারা কাঁপে ; বেদনায় মনের আশারা।
মৃত্যু যেথা অবনত, শান্তি সেথা সমাসীন—তুমি
মুক্তপক্ষে প্রদক্ষিণ করে গেছ সেই কক্ষভূমি
গ্লানি আছে তবু সেই গ্লানির ওপরে।

তুমি তো গিয়েছ ফিরে আকাশের ঘরে।

তাই বুঝি ধূপছায়া নদীটির পাশে হায়,— চিল
কেঁদে আজো ক্লান্ত নয়। শান্ত স্নিগ্ধ স্থির অনাবিল।

নিদ্রাদীপ্র

শক্তি দেব

অনেক নামের পাশে ছায়া ফেলে রেখে
একটি নামের পাখি এমন সন্ধ্যেবেলা উড়ে গেল অন্য কোন আকাশের কোণে
বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে ;
হয়ত বা নাটোরের দিকে—
অভিমানে চলে গেছে, বলে গেছে : ফিরবে না কোনদিন সে নাটোর থেকে।
এখানে অন্ধকারে হে হৃদয় তাকে আর এনো নাক ডেকে।

যেখানে আকাশ জুড়ে বেদনার লক্ষ চিতা জ্বলে
সেখানে কেঁদেছে চিল নারীর মতন,
মেঘছায়া ব্যথাময় নিবে যাওয়া চাঁদের আসরে
একটি তারার মত আচমকা ঝরে গিয়ে কেঁদেছে সে-মন।
রোজ রাতে অন্ধকারে চোখ মেলে দেখেছে নিজেই
ইচ্ছা-চিন্তা-স্বপ্ন কিছু নেই।

সেদিন বোঝেনি কেউ মৃত্যুর আগে
কি চেয়েছে ঐ মন বকুল আর পলাশের বনে—
কি চেয়েছে, কতটুকু ; থরেথরে কামনার দীপালি সাজিয়ে
চেয়েছে বোঝাতে মনে গাঢ় অনুরাগে।
এমন আশ্চর্য চোখ হারালো কোথায় বলো নেই তার দিশা,
তাই আজ বিদিশার মুখর বাতাস
জাগায় না হাওয়াকাঁপা মাটির পেয়ালাভরা টলোমলো ঘাস।
বিকেলের রোদে শুধু অশ্রু-অমানিশা।

অনেক মুহূর্ত পল ক্ষয় করে বুঝেছিলে, সকালের গোলাপের মন
থাকবে না চিরদিন, থাকে শুধু প্রেমিকার চোখে-কাঁপা জলের মতন
কোনো এক অশোক সময়।
নিবিড় আলোর মত এ পাখির গোপন হৃদয়
জীবনের ঘাসে ঘাসে কী যেন লুকায়,
পারে না ছড়িয়ে যেতে পৃথিবীর এত আলো ভৈরবী গানের ছায়ায়।

শুধু এই প্রকৃতির রূঢ় আয়োজনে
মানুষেরা তাড়া খায়, ব্লিজার্ডের তাড়া—
ভয়ে ভয়ে খুঁজে ফেরে কিছু কড়ি—কবরের ভাড়া—
তারপর নেমে যায় মৃত অজ্ঞানে।

তেমন নামের পাখি আজ আর নেই
মাটির হৃদয় ছিঁড়ে উড়ে যায়। ব্যথা দিয়ে, গান গেয়ে আর
চলে যায় দূরতর নক্ষত্রের দিকে, যেন স্বপ্নের শিখার
মত। ঘুরে ক্লান্ত হয়ে শেষে
মিশে যায়। গান থাকে মাটির আকাশে।

বেদনায় উড়ে উড়ে ক্লান্ত পাখি যদি
এখন ঘুমাতে চায় তবে তাকে নিদ্রা যেতে দাও নিরবধি।
ব্যথা পেয়ে বুঝি আমি : তবু আর তাকে
ডেকো না এখন—
জাগিও না তাকে আর ধানসিড়ি নদীতীর থেকে।

আহা তুমি তাকে আর ডেকো নাক মন।

চিঠিপত্র

১

রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি :

৩রা পৌষ
১৩৩৭ ?
66 Harrison Road
Calcutta.

শ্রীচরণেষু,

আপনার স্নেহাশীষ লাভ ক'রে অন্তর আমার পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। আজকালকার বাংলাদেশের নবীন লেখকদের সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য এই যে তাদের মাথার ওপরে স্পষ্ট সূর্য্যালোকের মত আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীকে তারা পেয়েছে। এত বড় দানের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হোলে যতখানি গভীর নিষ্ঠার দরকার দেবতা পূজারীকে কখনও তার থেকে বঞ্চিত করেন না। কিন্তু এ দানকে ধারণ ক'রতে হোলে যে শক্তির প্রয়োজন তারি অভাব অনুভব কচ্চি। অক্ষম হোলেও শক্তির পূজা করা এবং শক্তির আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করা আমার জীবনের সব চেয়ে বড় সাধনা। আর আমার জীবনের আকিঞ্চন সেই আরাধ্যশক্তি ও সেই কল্যাণময় শান্তির উৎসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। আশা করি এর থেকে আমি বঞ্চিত হব না।

পত্রে আপনি যে কথা উল্লেখ করেছেন সেই সম্পর্কে দু-একটা প্রশ্ন মনে আসচে। অনেক উঁচু জাতের রচনার ভেতর দুঃখ বা

আনন্দের একটা তুমুল তাড়না দেখতে পাই। কবি কখনও আকাশের সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করবার জন্য উৎসাহে উন্মুখ হ'য়ে ওঠেন,—পাতালের অন্ধকারে বিষজর্জ্জর হ'য়ে কখনও তিনি ঘুরতে থাকেন। কিন্তু এই বিষ বা অন্ধকারের মধ্যে কিম্বা এই জ্যোতি-র্লোকের উৎসের ভেতরেও প্রশান্তি যে খুব পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে তা তো মনে হয় না। প্রাচীন গ্রীকরা Serenity জিনিষটার খুব পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের কাব্যের মধ্যেও এই সুর অনেক জায়গায় বেশ ফুটে উঠেছে। কিন্তু যে জায়গায় অন্য ধরণের সুর আছে সেখানে কাব্য অক্ষুণ্ণ হ'য়েছে ব'লে মনে হয় না। দান্তের Divine Comedy-র ভেতর কিম্বা শেলীর ভেতর Serenity বিশেষ নেই। কিন্তু স্থায়ী কাব্যের অভাব এঁদের রচনার ভেতর আছে ব'লে মনে হয় না। আমার মনে হয় বিভিন্ন রকমের বেষ্টনীর মধ্যে এসে মানুষের মনে নানাসময় নানারকম moods খেলা করে। সে mood-গুলোব প্রভাবে মানুষ কখনও মৃত্যুকেই বঁধু ব'লে সম্বোধন করে, অন্ধকারের ভেতরেই মায়ের চোখের ভালোবাসা খুঁজে পায়, অপচয়ের হতাশার ভেতরেই বীণার তার বাঁধবার ভরসা রাখে। যে জিনিষ তাকে প্রাণবন্ত ক'রে তোলে অপরের চোখে হয়তো তা নিতান্তই নগণ্য। তবু তাতেই তার প্রাণে সুরের আগুন লাগে,—সে আগুন সবখানে ছেয়ে যায়। mood-এর প্রক্রিয়ায় রচনার ভেতর এই যে সুরের আগুন জ্ব'লে ওঠে তাতে Serenity অনেক সময়েই থাকে না—কিন্তু তাই বলেই তা সুন্দর ও স্থায়ী হ'য়ে উঠতে পারবে না কেন বুঝতে পারছি না।

সকল বৈচিত্র্যের মত সুরবৈচিত্র্যও আছে সৃষ্টির ভেতর। কোনো একটা বিশেষ ছন্দ বা সুর অন্য সমস্ত সুর বা ছন্দের চেয়ে বেশী ক'রে স্থায়ী স্থান কি করে দাবী করতে পারে? আকাশের নীল রং, পৃথিবীর সবুজ রং, আলোর শ্বেত রং কিম্বা অন্ধকারের কালো রং—সমস্ত রংগুলিরই একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ও আকর্ষণ আছে। একটিকে অন্যটির চেয়ে বেশী সুন্দর বা সুচির বলা চলে ব'লে মনে হচ্চে না। এই অন্ধকার, এই আলো, আকাশের নীল, পৃথিবীর শ্যামলিমা—সবই তো সুচির—সুন্দর। সৌন্দর্য্য ও চিরত্বের বিচার তাই একটু অন্য ধরণের ব'লে মনে হয়। ঘুড়ির কাগজের সবুজ, নীল, শাদা বা কালো রং যখন পৃথিবী, আকাশ, প্রভাত বা রাত্রির বর্ণের সৌন্দর্য্য ও স্থায়িত্বের দাবী ক'রে বসে তখন আর কোনো প্রসঙ্গের প্রয়োজন থাকে না। আমার তাই মনে হয় রচনার ভেতর যদি সত্যিকার সৃষ্টির মর্য্যাদা থাকে তা হোলে তার ভেতরকার বিশিষ্ট সুরের প্রশ্নটি হয়তো অবহেলাও করা যেতে পারে। শান্তি বা Serenity-র সুরে কবিতা বেঁধেও সত্যিকারের সৃষ্টির প্রেরণার অভাব থাকলে হয়তো তাও নিষ্ফল হ'য়ে যায়।

বীঠোফেনের কোনো কোনো Symphony বা Sonata-র ভেতর অশান্তি র'য়েছে, আগুন ছড়িয়ে পড়ছে,—কিন্তু আজো তো টিঁকে আছে—চিরকালই থাকবে টিঁকে তাতে সত্যিকার সৃষ্টির প্রেরণা ও মর্য্যাদা ছিল বলে।

আমার যা মনে হয়েছে তাই আপনাকে জানিয়েছি। আপনার অন্তরলোকের আলোপাতে আমার ত্রুটি ও অক্ষমতাকে আপনি মার্জ্জিত ক'রে নেবেন আশা করি। আপনার কুশল প্রার্থনীয়। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত শ্রীজীবনানন্দ দাশ

উ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়েষু

তোমার কবিতাগুলি পড়ে খুসি হয়েছি। তোমার লেখায় রস আছে, মাধুর্য্য আছে এবং ভাবিবার খোরাক যথেষ্ট আছে। ইতি ১২।৩।৩৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন দাশ

সত্যবন্ধু ভবন

বরিশাল

Barisal

২

সর্ব্বানন্দ ভবন

বরিশাল

২৬. ১২. ৪৫.

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। উত্তর দিতে খুব দেরি হয়ে গেল। আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম ; হাতেও অনেক কাজ ছিল। তা ছাড়া এ ধরণের চিঠি একটু সময় নিতে চায়। কাজেই যথাসময়ে লিখতে পারি নি ; ক্ষমা ক'রবেন।

আপনার চিঠি লেখার ধরণটি সুন্দর ও পরিপাটি ; আমরা যখন সন্ত এম-এ পাশ ক'রে বেরিয়েছিলাম এ রকম লিখতে পারতাম কিনা সন্দেহ।

কবিতা রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারা যায় এই : যখনই 'ভাবাক্রান্ত' হই, সমস্ত ভাবটা বিভিন্ন আঙ্গিকের পোষাকে ততটা ভেবে নিতে পারি না, যতটা অনুভব করি ;—একই এবং বিভিন্ন সময়ে। অন্তঃপ্রেরণা আমি স্বীকার করি।[১] কাব্য সম্পর্কে ইংরেজিতে imagination শব্দটি প্রচলিত আছে. এর বাংলা কি ?—যে কবির কল্পনাপ্রতিভা আছে সে ছাড়া আর কেউ কাব্যসৃষ্টি ক'রবার মত অন্তঃপ্রেরণার দাবি ক'রতে পারে কি ? এবং এ প্রেরণা ছাড়া শ্রেষ্ঠ কবিতা লেখা কি করে সম্ভব হ'তে পারে ?[২] যদিও কোনো কোনো কবি এর তাগিদ সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে চান, তবুও তাঁদের ভালো কবিতা প'ড়ে বোঝা যায় যে তাঁদের আত্মালোচনায় অসম্পূর্ণতা রয়েছে। বুদ্ধিমান—এমন কি জ্ঞানী বিজ্ঞানী মানুষের

পক্ষেও নিছক বিজ্ঞান বা জ্ঞানসত্তার বলে প্রায় mechanically মহৎ কবিতা লেখা সম্ভব নয়। কিন্তু ভাবপ্রতিভাজাত এই অন্তঃপ্রেরণাও সব নয়; তাকে সংস্কারমুক্ত শুদ্ধ তর্কের ইঙ্গিত শুনতে হবে; এ জিনিষ ইতিহাসচেতনায় সুগঠিত হওয়া চাই।

এই সব কারণেই—আমার পক্ষে অন্তত—ভালো কবিতা লেখা অল্প কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার নয়; কবিতাটিকে প্রকৃতিস্থ ক'রে তুলতে সময় লাগে। কোনো কোনো সময় কাঠামোটি, এমন কি প্রায় সম্পূর্ণ কবিতাটিও খুব তাড়াতাড়ি সৃষ্টিলোকী হয়ে ওঠে। কিন্তু তারপর—প্রথম লিখবার সময় যেমন ছিল তার চেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে —চারদিককার প্রতিবেশচেতনা নিয়ে শুদ্ধ প্রতর্কের আবির্ভাবে কবিতাটি আরো সত্য হয়ে উঠতে চায়: পুনরায় ভাবপ্রতিভার আশ্রয়ে। এ রকম অঙ্গাঙ্গি-যোগে কবিতাটি পরিণতি লাভ করে। এর ফলে, আমার এক বন্ধু আমাকে যা লিখেছেন, "কবিতার প্রত্যেকটি আঙ্গিক অন্য প্রত্যেকটি আঙ্গিককে স্পষ্ট ও সুসমঞ্জস ক'রে তোলে। এতে ক'রে কোনো একটি বিশেষ ছত্রের দাম হয়তো ক্ষুণ্ণ হয়, কিন্তু সমস্ত নক্সাটার উজ্জ্বলতা চোখে পড়ে বেশি।" কিন্তু এ রকম ঐকান্তিক কবিতা আমি বেশি লিখতে পারি নি। এর কারণ, ভাবপ্রতিভা, তাকে বলয়িত ক'রে নেবার অবসর ও শক্তি, এবং প্রজ্ঞাদৃষ্টির উপযুক্ত প্রভাব কোনো-না-কোনো কারণে কিছু শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

(আমার কাব্যপ্রেরণার উৎস নিরবধি কাল ও ধূসর প্রকৃতির চেতনার ভিতর রয়েছে বলেই তো মনে করি। তবে সে প্রকৃতি সব সময়ই যে 'ধূসর' তা' হয়তো নয়।)[৩]

(যাকে আপনি বলেছেন) মহাবিশ্বলোকের ইসারা থেকে উৎসারিত সময়চেতনা, Conciousness of Time as a universal, তা' আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য্য সত্যের মত ; কবিতা লিখবার পথে কিছু দূর অগ্রসর হয়েই এ জিনিষটাকে আমি না গ্রহণ ক'রে পারি নি। এর থেকে বিচ্যুতির কোনো মানে নেই আমার কাছে। তবে সময়চেতনার নতুন মূল্য আবিষ্কৃত হতে পারে।

আজ পর্য্যন্ত যে সব কবিতা আমি লিখেছি সে সবে আবহমান মানবসমাজকে প্রকৃতি ও সময়ের শোভাভূমিকায় এক 'অনাদি' তৃতীয় বিশেষত্ব হিসেবে স্বীকার ক'রে কেবল মাত্র তারি ভিতর থেকে উৎস-নিরুক্তি খুঁজে পাই নি ; ৪ কেউ কি পায় ? পেলে লিরিক বৈশিষ্ট্যের একাগ্রতা ভেঙে কবিতা নাট্যপ্রাণ পবিত্রতায় মুক্ত হতে পারত। নাট্যকবির পক্ষে ওটা পাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আজো আমি লিরিক কবি,—এই পথে রয়েছে আর এক রকম বিচিত্র শুদ্ধতা।...সাহিত্যের বড় বাজারে আমার কবিতা কাটে ব'লে মনে হয় না ; তবে যে বাজারে কাটে সেখানে গ্রহীতার সংখ্যা বরং কম। তাঁদের ভিতর থেকে দু-একজন যদি আমাকে জানান (যেমন আপনি জানিয়েছেন) যে, "সেখানে আমরা দু-একজন থাকি অনেক বেশী দাম দিয়ে, অনেক ক্ষতি স্বীকার ক'রে, অনেক কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পাহাড়ের চূড়ায় চড়বার জন্য তৈরী হয়ে, কৃষ্ণনীল সময়ের ডানায় নিজেদের ভয়ে ভয়ে বেঁধে নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রের কোটি আলোক-বৎসরের সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্য তৈরী হয়ে"—তাহ'লে স্পষ্ট আশ্বাস পাওয়া যায়।

কোনো কিছুকে 'চরম' ভেবে সুস্থিরতা লাভ করবার চেষ্টায় আত্মতৃপ্তি নেই, ' রয়েছে হয়তো কবির ভাবনাপ্রসাদ ; চরম ভেবে আঁকড়ে থাকার ভিতর নির্ব্বাণ-অনির্ব্বাণেরও সমন্বয়স্বপ্নও আছে, শান্তি আছে, মাত্রাচেতনা আছে, উত্তেজনাও যে নেই, তা' নয়, কিন্তু তা 'নিরিখে'র সান্ত্বনায় ফিরে আসে। আমিও সাময়িকভাবে কোনো কোনো জিনিষকে চরম মনে ক'রে নিয়েছি জীবনের ও সাহিত্যের তাগিদে, মনকে চোখ ঠার দিয়ে মাঝে মাঝে,—temporary suspension of disbelief হিসেবে। কিংবা কখনো কখনো মনকে এই ব'লে বুঝিয়েছি যে যাকে আমি শেষ সত্য ব'লে মনে করতে পারছি না, তা' তবুও আমাদের আধুনিক ইতিহাসের দিক-নির্ণয়-সত্তা ; আজকের প্রয়োজনে চরম ছাড়া হয়তো আর কিছু নয়। কিন্তু তবুও সময়-প্রসৃতির পটভূমিকায় জীবনের সম্ভাবনাকে বিচার ক'রে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা লাভ করতে চেষ্টা ক'রেছি ; (অনেকদিন ধ'রেই পরিপ্রেক্ষিতের আবছায়া এত কঠিন যে) এর চেয়ে বেশি কিছু আয়ত্ত করে কবিদের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব না হ'লেও কিছুটা সুদূরপরাহত।

আপনার চিঠির জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার চিঠি প'ড়ে বুঝতে পারা যায় যে সাহিত্যের বিচারে এই বয়সেই আপনার দৃষ্টিশুদ্ধি ঘটেছে ; প্রকাশ করবার ক্ষমতা বেশ গড়ে উঠেছে। লেখা ছাপিয়েছেন কোথাও ? দূরে থাকি—সব পত্রিকা বা লেখকদের নাম আমার চোখে পড়ে না। আমি আপনাকে নানারকম রচনা বিশদভাবে লিখে ছাপাতে অনুরোধ করছি। আমার কবিতার বই আপনাকে পাঠিয়ে দিতে পারি বিস্তৃত সমালোচনার জন্য ; অবশ্য এই বই-

গুলোতে আমার শেষের দিকের প্রায় কোনো কবিতাই নেই। 'মকরসংক্রান্তির রাতে' প্রভৃতি অনেক কবিতা পরবর্ত্তী বইয়ে বেরুবে।···আমার কাব্য আলোচনা ক'রে আপনাকে ছাপাতে অনুরোধ করা যদিও আত্মরতি এক রকম, তবু্ও সাহিত্যের—বিশেষতঃ আমার কবিতা—সম্পর্কে এমন একজন শিল্পামোদী, সুস্পষ্ট বিশেষজ্ঞকে চুপ ক'রে থাকতে দেখলে কুণ্ঠা বোধ করব।

যে সব চিঠি নেহাৎ লোকাচারের ব্যাপার তাদের উত্তর আমি যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দেই। কিন্তু যেগুলো মনস্পর্শিতার জন্য বিখ্যাত—যেমন আপনারটি—সে সবের উত্তর দিতে মাঝে মাঝে আমার খুব দেরি হয়ে যায়।

আশা করি ভাল আছেন। প্রীতিনমস্কার। ইতি

জীবনানন্দ দাশ

৩

সর্ব্বানন্দ ভবন
বরিশাল
২১. ১. ৫৬.

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি ও কবিতা পেয়ে খুশি হয়েছি। এবারও উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেল। এ জন্য গতবার যে কারণ দেখিয়েছি তা থেকে নিশ্চয়ই আপনার মোটামুটি ধারণা হয়েছে যে আমি আসলে অলস, কিংবা ভালো চিঠি-লিখিয়ে নই এবং এ সব দোষ স্বীকার করবার মত গুণ নেই আমার, কাজেই বড় কথা পেড়ে ছোট জিনিষকে চেপে রাখি। এ ধারণা একেবারে অসত্য নয়। আমি যা লিখে-ছিলাম, তাও মিথ্যা নয়। সংসারের মোটা লেনদেনের থেকে যে চিঠি যত দূরে সে চিঠি তত—সৎ কি অসৎ বলব না—শুদ্ধতর চৈতন্যের জিনিষ। এ সব চিঠির উত্তর দিতে অল্প-বিস্তর দেরি হবেই।

আমার কবিতা সম্পর্কে আলোচনা আপনি সহজবোধেই সুরু করুন। আপনার সহজবোধ তো অরসিকের নয়; লিখতে লিখতেই জিনিষটা আপনার দৃষ্টিলোক ক্রমায়ত ক'রে খুলে দেবে; পাণ্ডিত্য নয়, তার চেয়ে বড় জিনিষ, প্রজ্ঞা আপনাকে সাহায্য করবে। বই পড়ে পণ্ডিত হওয়া যায় বটে কিন্তু প্রজ্ঞা শেষ পর্য্যন্ত শুধু মাত্র ও-রকম বিদ্যা-সাপেক্ষ নয়; অন্য রকম জিনিষ; প্রবীণ চেতনায়ই বিচরণ করতে চায় বেশি; আপনি নবীন, কিন্তু আমার মনে হয় আপনার সহজবোধের সেতুসার্থকতা হয়তো বা তার খোঁজ পেয়েছে।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রেমের কবিতা নিয়ে আরম্ভ করতে পারেন। এক একটি কবিতা ধ'রে রিচার্ডসীয় বিশ্লেষণ-পন্থা মন্দ নয়। সেই আপনার ভালো লাগে লিখেছেন। এ সব বিষয়ে নিজের আকাঙ্ক্ষিত পথে চলেই চৈতন্য জেগে ওঠে; দোটানার আলোড়ন কাটিয়ে কথা ও ভাষা নির্ম্মলভাবে কেলাসিত হয়ে উঠবার সুযোগ পায়। কাব্য বিচারের পক্ষে এ সব অপরিহার্য্য।

আপনি প্রস্মৃতিজ্ঞান ও সময়চেতনা সম্পর্কে যা লিখেছেন আমারও ধারণা সে রকম প্রায়। লিখেছেন, একদিন মানব-মনের আলো নিভবে; মানে, ব্যক্তির বা মানবের শেষ হবে? সে অবসান এলে উপরোক্ত চেতনাসৃষ্টির ভিতর অন্য কোথাও এ রকম পদার্থনির্ভর সত্য হয়ে থাকবে কিনা বলা কঠিন। মিস্টিক উত্তরের উৎস এই প্রশ্ন নিজেই মিস্টিক—আজ পর্য্যন্ত।

আপনার কবিতাটি ভালো লেগেছে।···

··· ···

আমি B. M. College-এ প'ড়ে B. A., ও M. A. কলকাতার Presidency College থেকে পাশ করেছি। সে অনেক আগেকার কথা।

প্রীতিনমস্কার। ইতি

জীবনানন্দ দাশ

৪

সর্ব্বানন্দ ভবন

বরিশাল

২. ৭. ৪৬.

প্রীতিভাজনেষু,

কলকাতার থেকে যে কার্ড লিখেছিলাম তা' পেয়েছেন আশা করি। আধুনিক বাংলা কবিতার ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার কাজে হাত দিয়েছেন কি ?

(১) আমার কাব্যগ্রন্থগুলো আপনি চেয়েছেন। এ পর্য্যন্ত আমার চারটে কবিতার বই বেরিয়েছে ; আমার পঞ্চম কবিতার বই—যার ভিতরে আমার শেষের দিকের অনেক representative কবিতা থাকবে তা' এখনও গ্রন্থাকারে বেরয় নি ; সে সবের পাণ্ডুলিপিও আমার কাছে নেই—press-এ আছে ; বই বেরুতে বেশ কিছু দেরি হবে। আপনার চিঠি পেলে আমার তুখানা বই আপনাকে পাঠিয়ে দেব। প্রথম কবিতার বইটি পাঠাব কিনা ভাবছি ; সে বইয়ের বিশেষ কোনো importance আছে ব'লে মনে হয় না। আর 'বনলতা সেন' বইটের সমস্ত কবিতাই 'মহাপৃথিবী'তে আছে।

(২) 'কল্লোল' 'কালিকলম' 'প্রগতি' ইত্যাদির কোনো সংখ্যা এখন আমার কাছে নেই। কলকাতায় কোনো কোনো প্রবীণ সাহিত্যিকের কাছে থাকতে পারে।

(৩) আমার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও পরিচয় চেয়েছেন। সম্প্রতি বড় ঝঞ্ঝাটের ভিতর আছি ; লিখবার তাগিদ নেই। আপনি কি জানতে চাচ্ছেন তাও স্পষ্ট বুঝতে পারছি না।...আমার জন্ম হয়েছিল বরিশালে

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসে। পড়েছিলাম B. M. School-এ B. M. College-এ, Presidency College, University ও Law College-এ। শেষ পর্য্যন্ত আইন পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। অধ্যাপনা ক'রেছি কলকাতায় City College-এ, দিল্লীর এক College-এ, বরিশালে B. M. College-এ। আরো ২।৪ রকম কাজ ক'রেছি ফাঁকে ফাঁকে। এখনও অধ্যাপনাই করতে হচ্ছে। কিন্তু মনে হয় এ পথে আর বেশি দিন থাকা ভালো না। যে জিনিষ যাদের যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সবই অসাড়তার নামান্তর নয় কি? এইবার নতুন পটভূমি নেমে আস্মুক।

আমাদের পরিবার খুব বড়—কিন্তু সাহিত্যপ্রীতি ও রচনারীতির উৎকর্ষ লক্ষ্য করেছি বাবার জীবনে। তিনি অনেক ইংরেজি ও দেশী বই কিনতেন ও পড়তেন; ভালো Library ছিল তাঁর; সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহী যুবা ও প্রৌঢ়দের আনাগোণা ছিল তাঁর গ্রন্থাগারে। বাবা মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিতেন তাঁদের বিদেশী ও দেশী সাহিত্য। নিজে বিশেষ কিছু লিখতেন না। যে ক'টি রচনা তাঁর পেয়েছি তাতে উচ্ছ্বাস কম—সংহতি বেশি। খুব তত্ত্বজ্ঞানী মানুষ ছিলেন। মা অনেক কবিতা লিখেছেন। সে সব কবিতার শাদা ঝর্ঝরে শব্দনিক্বণ ও আশ্চর্য্য অর্থসঙ্গতি বরাবরই আমাকে প্রলুব্ধ ক'রেছে; কিন্তু তবুও আমি প্রথম থেকেই অন্য পথ ধরে চলেছি। আমি খুব সম্ভবত জাত সাহিত্যপ্রেমিক। যে আব-হাওয়ায় ছিলাম তাতে উত্তরকালে ভালো সাহিত্যরসিক হয়েই মুক্তিলাভ করা যায় না, নিজের তরফ থেকে কিছু সৃষ্টি করবারও সাধ হয়। ছেলেবেলা থেকেই গল্প উপন্যাস—স্বদেশী ও বিদেশী—

নেহাৎ কম পড়ি নি। ঔপন্যাসিক হবার ইচ্ছা ছিল, এখনও তা ঘোঁচে নি। শ্রেষ্ঠ সমালোচনাও অবসরের অভাবে দানা বাঁধতে পারছে না। না পারছি মহৎ নাট্য-সমালোচকের নেতিবাচক নিরাশা ভঙ্গ ক'রে তেমন কিছু নাটক লিখতে। এই দারুণ সংগ্রামকঠিন সময়ে নানারকম আধিজৈবিক দায়িত্ব মিটিয়ে যেটুকু সময় থাকে তাতে সাহিত্যের কোনো একরকম অভিব্যক্তি (যেমন কবিতা) নিয়েই যতদূর সম্ভব পটভূমির প্রসার ও গভীরতা বাড়ানো যায় সেই চেষ্টাই করা যেতে পারে। কিছু পরিমাণে এই জন্যই কবিতা লিখতে উৎসাহ পেয়েছি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রেরণা পেয়ে লিখেছি এই কারণে যে আমার যুক্তিধর্ম্মী মানস আধুনিক সময়ের সমস্ত সঙ্গ ও অহেতুকতার সংস্পর্শে এসে কবিমানসের দৃষ্টি-উজ্জ্বলতায় রূপান্তরিত হতে চেয়েছে (হয়তো হয়েছে) ব'লে। এর পর বলতে হয় কবিমানস কী, কবিতা কাকে বলে? এ নিয়ে অন্যত্র আলোচনা ক'রেছি, করব। আজ সময় নেই।

প্রথমেই 'কল্লোলে' কবিতা ছাপিয়েছি বল্লে ঠিক হবে না; কিন্তু 'কল্লোলে'ই প্রথম কবিতা ছাপিয়ে ভালো লেগেছিল। 'কল্লোলে'র যুগে আমি কলকাতায় থাকতাম। 'কল্লোলে'র শ্রেষ্ঠ লেখকদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা, কথাবার্ত্তা হত। কিছুকাল পরে 'কালিকলম' বেরুল; 'কালিকলমে'র দিক-নিরূপক ছিলেন প্রেমেন্দ্র ও শৈলজানন্দ। মোহিতলাল 'কালিকলমে' কবিতা লিখতেন। 'কালিকলম'-অফিসেই নজরুল ইস্‌লামকে প্রথম দেখেছি। ভালো না মন্দ, বড় বা ছোট কী এক যুগ ছিল সেটা? যাই থাক না কেন, ইস্কুলে প'ড়বার সময় যেমন প্রমথ চৌধুরী, সত্যেন দত্ত, প্রভাত মুখুয্যে, ফরাসী ও

রুশ গল্পের 'ছায়াবলম্বনে'র ওস্তাদ সূপকার চারুবাবু ও মণি গাঙ্গুলি—ও পরে অন্য গ্রামে—শরৎ চাটুয্যেকে অন্তর্জীবনে বিজড়িত ক'রে নিতে হয়েছে, 'কল্লোলে'র যুগে তেম্নি সমালোচকদের পেয়েছি আর এক রকম ভাবে, অনেকটা নাগালের ভিতরে; মানসপরিধি থেকে পূর্ব্বজেরা তখন সরে গিয়েছেন খানিক দূরে—অনেক দূরে;—রবীন্দ্র বঙ্কিম ও বাংলা সাহিত্যের প্রাক্তন ঐতিহ্যও ধূসরায়িত হয়ে গিয়েছিল বড় বড় বৈদেশিকদের উজ্জ্বল আলোর কাছে। বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোল'-আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল। সাহিত্য ও জীবনের ঘুরুনো সিঁড়ি দুয়ে-মিলে এক হয়ে এক পরিপূর্ণ সমাজ-সার্থকতার দিকে চ'লেছে মনে হয়; 'কল্লোলে'র সাময়িকতা সেই সিঁড়ির একটা দরকারী বাঁক।

'কল্লোল' 'কালিকলম' ক্রমেই বিস্রস্ত হয়ে যাচ্ছিল।

বুদ্ধদেব বসুর 'প্রগতি' এল নতুন সম্ভাবনা ও উৎসাহ নিয়ে। ব্যক্তিগতভাবে 'প্রগতি' ও বুদ্ধদেব বসুর কাছে আমার কবিতা ঢের বেশি আশা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। সে কবিতাগুলো হয়তো বুদ্ধদেবের মতে আমার নিজের জগতের এবং তাঁরও পরিচিত পৃথিবীর বাইরে কোথাও নয়; স্পষ্টতাসম্ভবা তারা; অতএব সাহস ও সততা দেখবার সুযোগ লাভ ক'রে চরিতার্থ হ'লাম—বুদ্ধদেববাবুর বিচারশক্তির ও হৃদয়বুদ্ধির; আমার কবিতার জন্য বেশ বড় স্থান দিয়েছিলেন তিনি 'প্রগতি'তে এবং পরে 'কবিতা'য় প্রথম দিক দিয়ে। তারপরে—'বনলতা সেন'-এর পরবর্ত্তী কাব্যে আমি তাঁর পৃথিবীর অপরিচিত, আমার নিজেরও পৃথিবীর বাইরে চ'লে গেছি ব'লে মনে করেন তিনি।

'নিরুক্ত' ও 'পূর্ব্বাশা'র সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য মনে করেন আমার শেষের দিকের কবিতায় আমার পারিপার্শ্বিক-চেতনা প্রৌঢ় পরিণতি লাভ করেছে। এ পারিপার্শ্বিক অবশ্য সমাজ ও ইতিহাস নিয়ে। কিন্তু আরো দু-চার রকম চেতনা আছে, আজো যাদের কবিতায় শুদ্ধ ক'রে নিয়ে নির্ণয় ক'রে দেখতে আমি ভালোবাসি। সমাজ যত বিশুদ্ধ, বৈজ্ঞানিক ও কল্যাণকৃৎ হোক না কেন, প্রেম, প্রকৃতি, সৃষ্টি-প্রপঞ্চ সম্পর্কে শেষ আত্মপ্রসাদ কোনো ঐকান্তিক কবি বা মনীষীর জীবনে ঘটে কি? ঘটে নি তো আমার জীবনে। সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কেও আমার কবিতা চেতনা হয়তো দেখিয়েছে, আরো বড় চেতনায় উত্তরপ্রবেশ চেয়েছে, কিন্তু সেই জ্ঞানদৃষ্টি কি পেয়েছে যা সমাজকে নতুন পথ দেখাতে পারে? কিন্তু কোন্ কবি তার কবিতায় সেই অমোঘ 'বিজ্ঞানদৃষ্টি'র প্রভাবে সমাজ ও পৃথিবীকে নতুন পথ দেখিয়েছে—কবি-লক্ষিত যেই পথ বেয়ে মানুষ তার প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত সমাজ পেয়েছে? প্রয়াণের প্রথম দিন থেকে সুরু ক'রে আজো আমরা সে সমাজ পাই নি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-দিব্যতা—যা নতুন শুদ্ধ সমাজ মানবকে দান করতে পারে—এই দৃষ্টি-দিব্যতার দিক থেকে তা হ'লে কি অতীতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিই বিফল? কিংবা সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিই কি অল্লাধিক সার্থকতায় অবিচ্ছিন্ন সময়ের সমবেত চেষ্টায় বিজ্ঞানশুদ্ধ শুভ্র নিঃশ্রেয়স সমাজ গড়ছে? তা হয়তো গড়ছে (এ প্রয়াসের পথে কোনো শেষ কৈবল্যলোকও নেই হয়তো) যেমন সমস্ত শ্রেষ্ঠ মনীষী অর্থশাস্ত্রী ও সঠিক বিষয়ালোকিত সেবক ও সাধকেরা গড়ছে। আধিদৈবিক উপায়ে এরা যেমন করে গড়ছে সমাজস্রষ্টা কবিতা সে সফলতার দাবি ক'রতে পারে না হয়তো—

কিন্তু অন্য এক শ্রেষ্ঠ সার্থকতা রয়েছে তার—যেখানে শুদ্ধ সমাজ-সৃষ্টির শুভেচ্ছা বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিরীতির শুদ্ধতা (যা ও-রকম সমাজ রচনা ক'রছে, যদিও সে সমাজ আজো পাচ্ছি না আমরা) সব কিছু হ'য়েও আরো কিছুর অপেক্ষা রাখে যা বিষয় ও বিষয়-বিচারের উজ্জ্বলতাকে ভাবপ্রতিভার সাহায্যে কবিতার স্বতন্ত্র আভায় পরিণত করে।

আমার আধুনিক কবিতা এই সব ব্যাপারের থেকেই উৎসারিত হতে চাচ্ছে।

জীবনানন্দ দাশ

৫

সর্ব্বানন্দ ভবন
বরিশাল
৩১. ১০. ৪২.

প্রীতিভাজনাসু,

যথাসময়ে আপনার চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। চিঠির উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল। একবার ভেবেছিলাম লক্ষ্মীপূর্ণিমার পর কলকাতায় যাব। কিন্তু যাওয়া হ'ল না।

আপনার বাবা ও মা'র অসুস্থতার কথা শুনে চিন্তিত হয়েছি; আশা করি তাঁরা এখন ভাল আছেন। খুকু[১] হয়তো সপ্তাহখানেকের মধ্যে

কলকাতায় যাবে। তমলুকে এবার খুব বন্যা হয়েছে; আরো নানা-রকম গোলমাল; খুকুর মুখেই শুনতে পাবেন। খুকু আপনার কাছ থেকে যে ক'খানা বই এনেছে তা' পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি; ইচ্ছে ছিল বইগুলো আরো কয়েকদিন রাখি; কিন্তু খুকুর সঙ্গেই দিয়ে দেব। 'my best play' বইখানা হয়তো রাখতে পারি; যদি রাখি ক্রিসমাসের সময় ফিরিয়ে দেব; আশা করি কিছু মনে করবেন না। কলকাতায় গেলে আপনাদের library দেখবার খুব ইচ্ছা; আমি বইয়ের খুব ভক্ত, অর্থাৎ মনের মতন বইয়ের; তা' যে শুধু সাহিত্য হবে এমন কোনো কথা নেই।

কিন্তু when it comes to reading, প্রায়ই নেড়ে চেড়ে রেখে দেই; কাজেই জ্ঞানবিজ্ঞানে আপনাদের চেয়ে অনেক পিছে পড়ে আছি।

কিন্তু তবুও বইয়ের নেশা কাটানো মুস্কিল।

... ...

আপনাকে তো আমি বলেছি কবিতা পাঠাব।[২] নানারকমের শারদীয় সংখ্যায় লেখা ছড়িয়ে এখন একটু বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আবার যখন লেখার দিকে টান ফিরে আসবে আপনাকে পাঠাব। কিন্তু তাই ব'লে লেখার ঝোঁক উৎকর্ষের দিকে সঞ্চারিত করতে পারব ব'লে মনে হচ্ছে না।

'বনলতা সেন' কবে বেরুবে এখনও ঠিক বলতে পারছি না। বুদ্ধ-দেবকে এখনও mss[৩] পাঠাতে পারি নি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নতুন এডিশন এখন বের করা সম্ভব হবে না। এ দেশের প্রকাশকেরা কেউ নিজের খরচে বড় একটা কবিতার বই ছাপাতে চান না। আমাদের

পক্ষেও ছাপানো কঠিন। যা হোক, আমার ইচ্ছা আছে পরিস্থিতির উন্নতি হ'লে এ সম্পর্কে একটা কিছু ব্যবস্থা করব।

... ...

অধ্যাপনা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সে সবের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনি যা লিখেছেন ঠিকই। তবে অধ্যাপনা জিনিষটা কোনো দিনই আমার তেমন ভালো লাগে নি। যে সব জিনিষ যাদের কাছে যে রকম ভাবে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তাতে আমার বিশেষ আস্থা নেই। এ কাজে মন তেমন জাগে না; তবু সময়-বিশেষে অন্য কোনো কোনো প্রেরণার চেয়ে বেশী জাগে তা' স্বীকার করি। এ বিষয়ে আপনার আনন্দ ও উৎসাহ আমার চেয়ে ঢের বেশী। সেইটেই ভালো, এবং আমি খুব গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি।...

আমরা ভালই আছি। আপনাদের কুশল প্রার্থনীয়।

প্রীতিনমস্কার। ইতি

জীবনানন্দ দাশ

১. সুচরিতা দাশ, কবির কনিষ্ঠ সহোদরা।

২. কল্যাণী সেন সম্পাদিত 'মেয়েদের কথা' মাসিক পত্রিকার জন্যে।

৩. 'কবিতা ভবন'-প্রকাশিত 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের অন্যতম পুস্তিকা 'বনলতা সেন'-এর পাণ্ডুলিপি।

চিঠিখানি কবি-ভ্রাতৃজায়া শ্রীযুক্তা নলিনী দাশের কাছে লেখা। পত্রখানিতে 'আপনি' সম্বোধন লক্ষ্যণীয়; শ্রীযুক্তা দাশের বিবাহের পূর্বে এই পত্রখানি তাঁকে লিখেছিলেন কবি।

৬

Barisal
4. 7. 43.

কল্যাণীয়াসু,

নিনি,···এবার সুদীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটি কলকাতায় তোমাদের সঙ্গে কাটিয়ে খুবই আনন্দ লাভ করেছি। কলকাতায় গিয়ে এবার নানা-রকম অভিজ্ঞতা লাভ হ'ল; সাহিত্যিক, ব্যবসায়িক ইত্যাদি নানা-রূপ নতুন সম্ভাবনার ইসারা পাওয়া গেল। এর আগে মাঝে মাঝে আমি ২।৪ দিনের জন্য কলকাতায় যেতাম; কিন্তু নানাদিক দিয়ে কলকাতার সামাজিক, সাহিত্যিক ও অন্যান্য ব্যাপারে যে এ রকম সজীব পরিবর্ত্তন এসেছে তা' লক্ষ্য করবার সুযোগ পাই নি।

বরাবরই আমার আত্মবৃত্তি ও জীবিকা নিয়ে কলকাতায় থাকবার ইচ্ছা। এবার সে ইচ্ছা আরো জোর পেয়েছে।

কিন্তু পথ কেটে নেবার জন্য সাধনার দরকার।

কলকাতায় তোমাদের বাড়ীতে অশোকের[১] ও তোমার যত্নে ও পরিচর্য্যায়, উদারতায় ও নিঃস্বার্থ ব্যবহারে খুবই খুশি হয়েছি।

··· ···

তোমার কাছ থেকে যে বইগুলো আমি এনেছি সে জন্য খুবই কৃতজ্ঞ। পূজোর সময় ফিরিয়ে দেব। কিনবার মত বাংলা বইয়ের একটা লিস্টি তোমাকে শীগগিরই পাঠাব। আমারও পড়বার সুযোগ হবে।

মা'র শরীর কেমন আছে? তিনি যেন আমাদের জন্য কোনো চিন্তা না করেন।

... ...

আমার আন্তরিক প্রীতি তোমাদের জন্য। ইতি

দাদা

১. কবি-অনুজ শ্রীযুক্ত অশোকানন্দ দাশ।

পত্রখানি শ্রীযুক্তা নলিনী দাশের কাছে লেখা, তাঁর বিবাহের পরে পত্রখানি লিখেছিলেন কবি।

॥ 'আমার কবিতা সম্বন্ধে চারদিকে এত অস্পষ্ট ধারণা যে আমি নিজে এ বিষয়ে একটি বড় প্রবন্ধ লিখব ভাবছিলাম।' জীবনানন্দের একখানা চিঠিতে আমরা এই মতটি দেখতে পাই; আবার আর একখানাতে: 'আমার কবিতা সম্বন্ধে নানা জায়গায় নানা রকম লেখা দেখেছি, মন্তব্য শুনেছি; প্রায় চোদ্দ আনি আমার কাছে অসার বলে মনে হয়েছে;...আমার মনে হয় প্রত্যেক সৎ কবি তার নিজের কাব্যের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সমালোচক; সেই হিসেবে নিজের কাব্য বিশ্লেষণ ক'রে এদের প্রত্যোকেরই দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা দরকার।'

এই সব মতামত তাঁর নিজের কাব্যের নানান্ ধরণের সমালোচনার সম্বন্ধে লাভ করে আমরা এ-টুকু ধরে নিতে পারি যে, তিনি ও-সব সমালোচনায় খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না; আর তাঁর মতে, তিনি নিজে যে প্রবন্ধ লিখবার কথা ভেবে-ছিলেন, অথচ যা লিখতে সময় পান নি আর, তা যদি পারতেন লিখতে তবে হয়তো তাঁর কাব্যের মূল অন্তঃপ্রেরণার কথাটি কুহেলিকামুক্ত হয়ে

সুস্পষ্টভাবে উদ্ঘাটিত হতে পারতো। জীবনানন্দ নিজে যদিও সাধারণ ভাবে বাংলা কবিতার বিভিন্ন অভিব্যক্তির কিছু-কিছু অভিনিবিষ্ট আলোচনা করে গেছেন, তবু বিশেষ করে শুধু নিজের কবিতারই প্রসঙ্গে প্রবন্ধাকারে কোনোদিন কিছু লিখেছেন কিনা সন্দেহ; তাঁর চিঠিপত্র সম্বন্ধে সেই জন্যে আমাদের সচেতন হওয়া কর্তব্য, কেননা, তাঁর সাহিত্য-বিষয়ক চিঠিপত্রের মধ্যে অপরিকল্পিত অবস্থায় হলেও হয়তো তিনি তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু-বান্ধবদের কাছে নিজের কাব্য সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করে থাকতে পারেন; প্রবন্ধাকারে কোনো স্বয়ং-কৃত বিশ্লেষণ পাওয়ার সুযোগ যখন নেই আর আমাদের, তখন অবিন্যস্ত বিশ্লেষণেও তাঁর কাব্য গ্রহণ করার পক্ষে অমেয় সাহায্য পাওয়া যাবে নিশ্চয়; বিভিন্ন সুধী সমালোচকের নিষ্ঠাবান আলোচনার পরেও এই বিক্ষিপ্ত সাহায্যের মূল্য, কবির নিজের ধারণা অনুসরণ করেই বলতে হবে, অশেষ।

আমরা বিশেষ করে এই দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর এই চিঠি ক'খানা প্রকাশিত করলাম, ব্যক্তি-জীবনানন্দের উদার স্বজনবৎসল রূপও হয়তো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কিছু-কিছু; ছাপতে হবে বলেই নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রশংসা-অপ্রশংসার প্রসঙ্গ-প্রধান চিঠিপত্র ছেপে লাভ নেই কোনো। শেষ দু'খানি বাদে অন্যান্য চিঠি ক'খানা কবির পুরোনো অবিন্যস্ত কাগজপত্রের ফাইল থেকে উদ্ধার করেছি আমরা; প্রত্যেকখানিই আসল চিঠির খসড়া বলে আমাদের ধারণা, অথবা এ-ও হতে পারে যে, কোনো কোনো চিঠি লিখিত হওয়ার পরে ভ্রমক্রমেই আর ডাকে দেওয়া হয় নি; কয়েকটা চিঠির পরিপাটি চেহারা দেখে খসড়া মনে হয় না আর; খসড়াগুলো তাঁর লেখার সাধারণত অজস্র অগোছালো কাটাকুটিতে অন্য কারুর চোখে দুর্বোধ্য হয়ে প্রতিভাত হতে পারতো। শেষ চিঠি দু'খানা কবি-ভ্রাতৃজায়া শ্রীযুক্তা নলিনী দাশের কাছে লেখা, তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি আমরা। অন্যান্য অনেক জিনিসের মতো বাকি চিঠিগুলো সব কবি-অনুজ শ্রীযুক্ত অশোকানন্দ

দাশ মুদ্রিত করতে দিয়েছেন আমাদের; তাঁর কাছ থেকে অবিরল যে সস্নেহ প্রশ্রয় পেয়েছি আমরা, তার তুলনা নেই।

রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত চিঠিখানার আর আজ তেমন মূল্য নেই হয়তো, তবু যতোটুকু মূল্য রয়েছে, তা এই সংখ্যাখানির পরে কমে যাবে আরো; রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিখানিতে যে-সব অভিযোগের উত্তর দিয়েছিলেন জীবনানন্দ, তেমন সব অভিযোগ আজ আর কেউ হয়তো আধুনিক কবিতার বিপক্ষে তুলবে না;—তুলবে না, বা, তুলছে না, তা-ও বলা যায় না হয়তো—তবু কবিতার সর্বব্যাপক বিষয়-পরিবেশ সম্বন্ধে জীবনানন্দের অভিমত কম অর্থবহ নয় আজো, তাঁর কবিমনীষাই যখন এতো ব্যাপক যে, তাঁর কাব্যের শেষ পর্যায়ে তা এমন গুরুতর বিষয়চয়নে নিবিষ্ট হয়েছে যে তাঁরই একান্ত ভক্তরাও তাতে দুরূহতার বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়েছেন অনেকে। ২-, ৩-, ও ৪-সংখ্যক চিঠিগুলি কার কাছে লেখা তা জানতে পারি নি আমরা, হয়তো প্রকাশিত হবার পরে জানতে পারবো, পাঠকদেরও জানানো যাবে তখন; মনে হয় যেন, একজনের কাছেই লেখা হতে পারে চিঠিগুলো সব; এই চিঠি ক'খানির মূল্য অপরিমেয়। এতে যেমন তাঁর শেষ পর্যায়ের কাব্যজগতে উত্তরপ্রবেশ সম্বন্ধে, অন্তঃপ্রেরণা সম্বন্ধে এবং মোটামুটিভাবে সমগ্র কবিতার সম্ভাব্য প্রগতি-প্রকরণ, দিক-নিরূপক উৎস-অভিজ্ঞা সম্বন্ধে তাঁর বিশিষ্ট অভিমত জানা যেতে পারবে, তেমন তাঁর জীবনপঞ্জীর বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধেও অনেক ভুল ধারণা নিরসন হতে পারবে; তাঁর কাব্যের ভবিষ্যৎ সৎ আলোচনায় এ-সব প্রশস্ত আলোকপাত যথেষ্ট সাহায্যকর জিনিস। কিন্তু ২-সংখ্যক চিঠির সঙ্গে বহুল সাদৃশ্য আছে, এমন একটি ছোটো পরিমাপের নিবন্ধাকার রচনা 'কবিতা সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ' শিরোণামায় 'পূর্বাশা'য় প্রকাশিত হয়েছিলো; হতে পারে, সে-রচনাটি এই চিঠিখানিরই একটি পরিমার্জিত ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ; সে-রচনাটির সঙ্গে উল্লিখিত পত্রখানির স্থানে-স্থানে প্রভেদ বেশ বিস্তৃত; উৎসাহী পাঠক 'পূর্বাশা'র রচনাটি পড়ে দেখতে

পারেন। তবু, সেই রচনাটিতে এমন সব প্রসঙ্গ মাঝে-মাঝে রয়েছে, যা এখানে বর্তমান নেই, অথচ সে-সব অবর্তমান বিষয়গুলো বিশেষভাবে উল্লেখ্য ; হয়তো পরে সে-সব প্রবিষ্ট করানো হয়েছিলো রচনাটি প্রকাশিত হবার আগে ; মোটামুটিভাবে প্রভেদগুলো এ-রকম :

১. এখান থেকে পরবর্তী অংশ 'পূর্বাশা'র প্রবন্ধে এমনি :

কবিতা লিখতে হ'লে ইমাজিনেশনের দরকার ; এর অনুশীলনের। এই ইমাজিনেশন শব্দটির বাংলা কি ? কেউ হয়তো বলবেন কল্পনা কিংবা কবিকল্পনা অথবা ভাবনা। আমার মনে হয় ইমাজিনেশন মানে কল্পনা-প্রতিভা বা ভাবপ্রতিভা। বুদ্ধি-ধী—সকলেরই আছে এ কথা বলা চলে না। কল্পনা সব মানুষের মনেই সমান বিস্তার ও নিবিড়তা পেয়েছে বা পেতে পারে এ কথা মনে করা ঠিক নয়। উৎকর্ষের তারতম্য আছে। কল্পনার (ও অন্যান্য মনোদৃষ্টির) সাহায্যে সাহিত্যসৃষ্টি হয়, কিংবা নবীন রাষ্ট্র, অর্থনীতি, বিজ্ঞান। কিন্তু এ সব বিভিন্ন ক্ষেত্রে কল্পনা একই ভাবে কাজ করে না, তার অন্তঃসারও একই রকমের নয়।

কিন্তু, এই পংক্তিটি 'পূর্বাশা'য় নেই :

কাব্য সম্পর্কে ইংরেজিতে…এর বাংলা কি ?

২. এখান থেকে পরবর্তী অংশ 'পূর্বাশা'য় এমনি :

এই প্রশ্নের উত্তরের মর্যাদায় টের পাওয়া যাবে আলোচনার বিচারসহনশীলতা।

কিন্তু, এই অংশটুকু আবার 'পূর্বাশা'য় নেই :

যদিও কোনো কোনো কবি…লেখা সম্ভব নয়।

৩. **(আমার কাব্যপ্রেরণার…তা হয়তো নয়।)**

অংশটুকু 'পূর্বাশা'য় নেই।

৪. এই অংশটুকু 'পূর্বাশা'য় নেই :

কেউ কি পায় ?…হতে পারত।

একটু অদল-বদল করে আছে তারপর :

নাট্য কবির পক্ষে এটা পাওয়া প্রয়োজন। প্রতিভাসিক কবিতাজগতের একাগ্রতা ভেঙে ফেলে তাকে নাট্যপ্রাণ বিশুদ্ধতা দেয় সেই কবি। কিন্তু তবুও তিন জগতেই বিচরণ ক'রে সে—মানবসমাজকেই চিনে নেবার ও চিনিয়ে দেবার মুখ্যতম প্রয়োজনে আন্তরিক হয়ে ওঠে। লিরিক কবিও ত্রিভুবনচারী, কিন্তু তার বেলায় প্রকৃতি,

সমাজ ও সময় অনুধ্যান কেউ কাউকে প্রায় নির্বিশেষে ছাড়িয়ে মুখ্য হয়ে ওঠে না; অন্ততঃ মানবসমাজের ঘনঘটায় প্রকৃতি ও সময় ভাবনা দূর দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে মিলিয়ে যাবার মত নয়। কাজেই উপন্যাস ও নাটকের মত মানুষ-মনকে সমূলে আক্রান্ত না ক'রেও কবিতা মানসের আমূল বিপর্য্যয় ঘটিয়ে দিতে পারে—তাকে নির্ম্মলতর ক'রে তুলবার জন্য—কথা ও ইঙ্গিতের দুর্লভ স্বল্পতার ভিতর দিয়ে।

কিন্তু আজো আমি...আশ্বাস পাওয়া যায়।—

এই অংশটুকু 'পূর্বাশা'য় নেই :

৫. এখান থেকে পরবর্তী অংশ 'পূর্বাশা'য় এমনি :

র'য়েছে বিশুদ্ধ জগৎ সৃষ্টি ক'রবার প্রয়াস—যাকে কবিজগৎ বলা যেতে পারে—নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স মুকুরের ভিতর বাস্তবকে যা ফলিয়ে দেখতে চায়। এতে করে বাস্তব বাস্তবই থেকে যায় না; দুয়ের একটা সমন্বয়ে সেতুলোক তৈরী হয়ে চলতে থাকে এক যুগ থেকে অপর যুগে—কোনো পরিনির্ব্বাণের দিকে কারু মতে; অল্পাধিক শুভ পরিচ্ছন্ন সমাজ-প্রয়াণের দিকে অন্য কারু ধারণায়; কবিজগতে যে পাঠকেরা ভ্রমণ করেছেন তাঁদের মনে (কিংবা হাতে) ইহজগৎ আবার নতুন ক'রে পরিকল্পিত হবার সুযোগ পায় তাই।

কিন্তু 'পূর্বাশা'র প্রবন্ধে এই অংশটুকু নেই :

রয়েছে হয়তো কবির...সান্ত্বনায় ফিরে আসে।

৫- ও ৬-সংখ্যক চিঠি দু'খানাতে সাহিত্যিক প্রসঙ্গ প্রায় নেই বলতে গেলে, পারিবারিক পরিবেশের স্নিগ্ধ চারিত্রিক চিত্রের কোনো-কোনো দিকের উজ্জ্বল প্রক্ষেপ এ-দু'খানায়। সঃ মঃ ॥

প্রবন্ধ

কবি জীবনানন্দ দাশ প্রসঙ্গে

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় প্রথম জীবনানন্দের কবিতা পড়েছিলাম তারপর কলকাতায় 'কবিতা'র পুরানো সংখ্যাগুলো কেনার জন্য একদিন 'কবিতা ভবনে' যাই। তখন বুদ্ধদেববাবুই প্রথম তাঁর আশ্চর্য কবিত্বশক্তির কথা বারংবার উল্লেখ করেছিলেন। স্কুলে পড়ি তখন—ম্যাট্রিক দেবো। সেইকালে আমরা দুই বন্ধু তাঁর অনুকরণে কবিতা লেখার প্রয়াস করেছিলুম।

তারপর তাঁকে প্রথম দেখি যখন আমরা আই. এ. ক্লাশের ছাত্র। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন তিনি। শ্যামরঙের স্বাস্থ্যবান মানুষ। চল্লিশোত্তর বয়স তখন। পরণে—ধুতি পাঞ্জাবী পাম্প-সু। কাঁধে পাট করে রাখা একখানা চাদর, হাতে একটি কি দুটি বই। মুখ তাঁর সর্বদা ভারী, গম্ভীর, চোখে আশ্চর্য চাঞ্চল্য এবং তীক্ষ্ণতা। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতেন। আমি আর আমার আরেক বন্ধু নির্মল চট্টোপাধ্যায় তাঁকে অবাক হয়ে দেখতুম ; কখনো ক্লাশের অবকাশে মাঠের ধারে শুয়ে শুয়ে পড়তুম তাঁর কবিতা। তখনও পর্যন্ত তাঁর শেষতম কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। কিছুদিন পরে 'কবিতা ভবন' থেকে 'এক পয়সায় একটি' কবিতা সিরিজে প্রকাশিত হলো তাঁর 'বনলতা সেন'। আমাদের মধ্যে সেদিন রীতিমতো সাড়া পড়ে গিয়েছিলো। নোতুন বয়সের অনভিজ্ঞ মনের কাছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যে সাড়া জাগাতে পারে নি, 'বনলতা সেন' দ্বারাই তা সম্ভব হয়েছিলো। 'বনলতা সেন' কবিতাটি আমরা যত্রতত্র মুখে মুখে আবৃত্তি করে বেড়াতুম। কলেজের এক অনুষ্ঠানেও আবৃত্তি করলুম একদিন।

একদিন বাড়িতে গেলাম তাঁর। কলেজে তাঁর প্রখর গাম্ভীর্যের জন্য কাছে

এগোতো না কেউ। সবারই ধারণা ছিলো তিনি ভীষণ রাশভারী প্রকৃতির লোক। আমরাও অবকাশ পেতাম না কথা বলার। বাড়ি তাঁর একটা মেয়ে ইস্কুলের কম্পাউণ্ডের মধ্যে। খুব সম্ভবতঃ সে ইস্কুলটা তাঁর পিতারই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। বাংলো ধরণের বাড়ি—উপরে শণের চাল। বেড়া আধেক ইঁট আর আধেক বাঁশের। কিন্তু ভিতরে সাহিত্য-পাঠকের কাছে আশ্চর্য এক জগৎ। বই—বই আর বই। বাংলার, বাংলার বাইরের অসংখ্য পত্রিকা। সবই সযত্নে গুছিয়ে রাখা—দেখেই মনে হয় বার বার পড়া। একধারে একটা ছোটো টেবিল। হয়তো তাঁর লেখার। অন্দরে ছিলেন তাঁর স্ত্রী এবং বালিকা কন্যা মঞ্জু দাশ। তাঁরাও কবিরই মতো স্বল্পভাষী—নির্জনতাপ্রিয়। সেইকালে, মঞ্জু দাশের বোধ হয়, বয়স দশ কী বারো। 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিলো।

সেদিন তাঁর বাড়িতে না গেলে 'জীবনানন্দবাবু অসামাজিক মানুষ' এই ধারণা করেই চিরদিন দূরে থেকে যেতাম। সে ধারণা অচিরেই ভেঙে গেল। অমন রাশভারী চেহারার ভিতরে একটি সহজ সরল শিশুর মন খুঁজে পেয়ে আমরা চমৎকৃত হয়ে গেলুম।

আমরা তখন লেখার মক্স করছি। কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ—কতো কী! আর মুখে 'প্রগতি-সাহিত্যে'র বাণীর খই ফুটছে। এই সময় কলেজে একদিন তাঁর সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় এক প্রগতিশীল ছাত্র-'কবি' হঠাৎ কথার মাঝখানেই তাঁকে প্রশ্ন করলে: আপনি জনগণের কবিতা লেখেন না কেন?

তার সাহস দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

জীবনানন্দবাবু এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কয়েকবার তার এবং আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি আস্তে প্রশ্ন করলেন: তুমি এই প্রগতিশীল সাহিত্য-আন্দোলনের মধ্যে আছো বুঝি?

সে বললে: হ্যাঁ। অবশ্যই। আমরা এই সমাজ-ব্যবস্থাকে বদলাতে চাই—কায়েম করতে চাই শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা। সেখানে কবি-সাহিত্যিকেরাও

আমাদের সঙ্গে আসবেন তাঁদের বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী পরিত্যাগ করে—মার্ক্সবাদ যে নতুন পথ দেখিয়েছে—

কথার মাঝখানেই জীবনানন্দবাবু হঠাৎ প্রশ্ন করলেন : তুমি কার্ল মার্ক্স পড়েছো? ডস ক্যাপিটাল?

ছাত্র-'কবি'টি থতমত খেয়ে বললে : না।

জীবনানন্দবাবু একটুকাল তার দিকে তাকিয়ে থেকে হাসি গোপনের বহু চেষ্টা করেও অকস্মাৎ উচ্চহাস্যে ফেটে পড়লেন। হঠাৎ সে হাসি। এমন আচম্বিতে বেরিয়ে আসা—যে, অবাক হয়ে দেখতে হয় তাঁকে। সঙ্গে হাসা যায় না।

ছাত্রটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পালিয়ে বাঁচলো।

জীবনানন্দবাবুর এই হাসিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবেগকে চেপে রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। ভালো লাগার আবেগকেও—অসংযত জীবন-যাপন তো দূরের কথা—রচনাতেও ছিলেন তিনি সংযমী। হাসির আবেগকেও লুকিয়ে রাখতে চাইতেন তিনি। অনেক সময়, দেখা গেছে, যে-হাসির প্রসঙ্গ উত্তীর্ণ হয়ে গেছি অনেক ক্ষণ, সেইকালে অকস্মাৎ বাঁধভাঙার মতো করে বেরিয়ে পড়েছে তাঁর হাসি। তবু এমন হাসতে তাঁকে তাঁর বন্ধুবান্ধব ছাড়া কেউ কখনো দেখে নি।

বন্ধু-সংখ্যা তাঁর প্রচুর নয়। অচিন্ত্যবাবু, প্রেমেনবাবু তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বুদ্ধদেববাবুও শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে খুব। 'কল্লোল'যুগের বহু লেখকের সঙ্গেই তাঁর জানাচেনা ছিলো। বরিশালের মানুষ হলেও, সেখানে কার্যোপলক্ষে থাকতে হলেও ছুটি-ছাটায় কলকাতায় যেতেন। দেখা-সাক্ষাৎ হতো অনেকের সঙ্গেই। যাঁরা তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছেন তাঁরা তাঁর সত্যিকারের মনটিকে চিনেছেন। নয়তো বাইরে তিনি নির্জনতাপ্রয়াসী, আত্মকেন্দ্রিক, অর্থাৎ ভদ্রতাহীন ভাষায় অসামাজিক বলেই পরিচিত ছিলেন। বরিশালের

মতো মফস্বল শহরে থেকেও তাঁর মনকে আমি কোনোদিন হাঁপিয়ে উঠতে দেখি নি। নিজের বাড়ি—তার সামনের মাঠ এবং ইংরেজী সাহিত্যের অসংখ্য কাব্য ও কবিতার বই-ই ছিলো তাঁর সব চেয়ে বড়ো সুহৃৎ।

শিক্ষকতায় তিনি সর্বজনপ্রিয় হতে পারেন নি। এ অতৃপ্তি তাঁর মনে অবশ্যই ছিলো। তাঁর কবিতা অন্যান্য অধ্যাপক-মহলে উপহাসের খোরাক জুগিয়েছে, দেখেছি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরবর্তী কবিতাগুলোতে 'সুররিয়্যালিস্ট' প্রভাব যতো বেশি প্রকট হয়ে উঠতে লাগলো ততো বেশি দুর্বোধ্য হতে লাগলো তাঁর কবিতা। সেই অনুপাতে হতে লাগলো অভিযোগ।

অনেক দিন তিনি জানতে চেয়েছেন, বাস্তবিকই তোমরা কিছু বুঝতে পারো না?

সত্যি কথা বলতে কী অনেক কবিতারই রসোদ্ধার সম্ভব হতো না, কিন্তু পড়তে ভালো লাগতো খুবই। কয়েকটি কবিতা ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি। সে ব্যাখ্যা এবং পরে কবিতাগুলি আবার পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলুম। কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ ছিলো না। আঙ্গিকে এবং উপমায় তাঁর মতো পরীক্ষা অধুনাকালের মধ্যে আর কেউই করেন নি। তিনি বলতেন, 'উপমাই কবিত্ব।' একটি কবিতাতে একটা লাইনে ছিলো—আগুন-বাতাস-জল ব্যবহৃত, ব্যবহৃত, ব্যবহৃত, ব্যবহৃত, ব্যবহৃত হয়ে হয়ে—ইত্যাদি।[১]

আনাড়ির মতো প্রশ্ন করেছিলাম, এতোগুলো 'ব্যবহৃত' কেন লিখেছেন?

বুঝিয়ে বললেন, বিষয়টার বহু ব্যবহারের একঘেয়েমিকে প্রকট করবার জন্য।

'বনলতা সেন' কবিতাটিতে একটি উপমা আছে 'পাখীর নীড়ের মতো চোখে'র। আরেকটিতে আছে—কাল রাতের হাওয়ায় আমার মশারী মৌশুমী সমুদ্রের পেটের মতো ফুলে উঠে স্বাতি নক্ষত্রের কাছে চলে গিয়েছিলো—প্রভৃতি।[২]—উপমা ও প্রতীক ব্যবহারে তিনি অসাধারণ। মাত্র 'বনলতা সেন' কবিতাটিই তার যথেষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু এগুলোও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরের কবিতা। এর আগে কবির প্রথম

কাব্যগ্রন্থ ছিলো 'ঝরাপালক'। সুন্দর সাবলীল ছন্দোবদ্ধ কবিতা। নজরুল ও সত্যেন্দ্র দত্তের কথা মনে পড়িয়ে দেয় সে-সব কবিতা।

এর পরেই শুরু করেন গদ্য ছন্দে কবিতা। সে-ক্ষেত্রে স্বপ্রতিষ্ঠ হলেন।

আমরা প্রথম বয়সে মনে করেছি গদ্য কবিতা লেখা খুবই সহজ। যেমন ভেবেছি কার্টুন ছবি দেখে যে, সে আঁকা সহজ। সেই কারণেই বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে দেখাদেখি গদ্য কবিতা লেখার হিড়িক পড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু পরে বুঝলাম, Basic drawing জানা না থাকলে যেমন কার্টুন দূরের কথা কোনো ছবিই আঁকা চলে না, তেমনি ছন্দে পাকা হাত না হলে গদ্য কবিতা লেখাও সম্ভব নয়। গদ্য কবিতাতেও যে ছন্দ আছে, থাকে—তা নোতুন কবিযশঃলিপ্সুরা খেয়ালই করেন না।

ছন্দে পাকা হাত ছিলো বলেই গদ্য কবিতার ক্ষেত্রেও জীবনানন্দ অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিতে পারলেন।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরের বই 'বনলতা সেন' এবং পূর্বাশা লিঃ থেকে প্রকাশিত 'মহাপৃথিবী'। 'মহাপৃথিবী'তে তাঁর পরীক্ষা আরো পরিণত এবং অন্বেষা আরো গভীর। 'পূর্বাশা'র সম্পাদক শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য এই কালে তাঁর সম্পর্কে একটা বিস্তারিত আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। এর আগে অবশ্য বুদ্ধদেববাবু 'কবিতা' পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন—প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'নিরুক্ত' কবিতা-পত্রিকাতেও তিনি নিয়মিত লিখতেন। প্রত্যেকটি আধুনিক কাব্যমহল জীবনানন্দকে নোতুন পথের দিশারী বলে স্বীকার করে শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিলো। তাঁর এর পরের বই 'সাতটি তারার তিমির'।

বরিশাল থেকে তিনি চলে গেলেন কলকাতায় দেশভাগের পরেই। বরিশালে আমরা তাঁর অত্যন্ত কাছাকাছি এসেছিলুম। তিনি আমার বরিশালের বাসায় এসেছেন অনেকদিন। আমাদের ছোটো টিনের ঘরের দোতলায় তাঁকে সাহিত্যের আড্ডাতেও পেয়েছি। একদিন সেই আড্ডায়

অচিন্ত্যকুমারকে দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন বলে মনে পড়ছে। মনে তাঁর কোনো ঘোর-প্যাঁচ বা সঙ্কীর্ণতা ছিলো না—সহজ সরল সাদাসিদে এবং নিরহঙ্কার ছিলেন তিনি। আরো ছিলেন বিনয়ী।

অনেকবার কলকাতায় এসেছি তাঁর সঙ্গে। একদিনের কথা মনে পড়ে। রেল-পথের দু'ধারে কৃষ্ণচূড়া, মাদার ও পলাশের গাছগুলি লাল হয়ে ছিলো। মাটির ভাঁড়ে করে চা খেতে খেতে সেই দিকে তাকিয়ে বাংলা কবিতার আলোচনা ভুলে গিয়েছিলুম।

কলকাতায় থাকতেন ১৮৩, ল্যান্সডাউন রোডে। দৈনিক 'স্বরাজ' পত্রিকায় কাজ নিলেন কিছুদিন পরে। রবিবারের সাময়িকী সম্পাদনার কাজ। তাঁর আগ্রহে সে-কাগজে কয়েকটি গল্প লিখেছিলুম। আজকের দিনের সবচেয়ে বড়ো গল্পলেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্ভবতঃ 'পদক' গল্পটিও সেই কাগজে প্রকাশিত হয়েছিলো। 'স্বরাজ' বন্ধ হয়ে যাবার পরে একটা মাসিক পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প করেছিলাম তিনি, আমি ও নির্মল চট্টোপাধ্যায় মিলে। কিন্তু 'বিজ্ঞাপন' সংগ্রহে তিন জনই অপটু ছিলাম বলে শেষ পর্যন্ত সাহসে কুলালো না।

তবু মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে—একসঙ্গে বেড়িয়েছি—গল্প করেছি। কিন্তু দেশ-ভাগের অব্যবহিত পরেই কলকাতার অর্থনৈতিক জীবনে যে আলোড়ন এসে পড়েছিলো—তাতে করে বেশি দিন আর সম্পর্ক রাখা চললো না। ঢাকায় আসার পর আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি। গত বছর কলকাতায় বন্ধু নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছিলাম তিনি কোথায় অধ্যাপনার কাজ নিয়েছেন। প্রশ্ন করে জেনেছিলাম, আমার খবরাখবরও তিনি নিতেন নির্মলের কাছ থেকে। অতঃপর এই অপঘাত মৃত্যু।

এর মধ্যে তাঁর লেখার সঙ্গে যোগাযোগ হারাই নি। এই সেদিনও 'চতুরঙ্গে' তাঁর আধুনিক বাংলা কবিতার ওপর আলোচনাটি পড়ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছে তাঁর আশ্চর্য গদ্যের কথা। যাঁরা তাঁর গদ্য প্রবন্ধগুলি 'কবিতা',

'পূর্বাশা', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি পত্রিকায়, বার্ষিকী 'বৈশাখী'—প্রভৃতিতে পড়েছেন তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন তাঁর নিজস্ব একটি গদ্য রীতি ছিলো। তা যেমন সুরেলা, তেমনি সুখপাঠ্য। বাংলা গদ্যে ও কাব্যের ক্ষেত্রে তিনি যে অসাধারণত্বের ছাপ রেখে গেলেন. তা তাঁকে অবশ্যই অমর করে রাখবে।

কিন্তু তবু এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে তাঁর খ্যাতি সাহিত্য-মহলের চৌকাঠ পেরিয়ে সাধারণ্যে পৌঁছয় নি। কারণ তিনি ছিলেন স্বল্পবাক, চলতেন ভিড় এড়িয়ে, লিখতেন না ঘন ঘন, সভায় না হতেন সভাপতি, না করতেন বক্তৃতা। সবচেয়ে বড়ো কথা না ছিলেন তথাকথিত ভাবে 'ফ্যাসীবিরোধী' বা 'প্রগতিশীল'। সেই কারণে তাঁরই জীবিতকালে তাঁর চেয়ে বহু বহু গুণে নিকৃষ্ট 'প্রগতিশীল' কবির ঢাক পিটিয়ে আমরা শ্রান্ত হয়ে গেছি—কিন্তু তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেই নি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা দেশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ঔপন্যাসিক হয়েও সাধারণ-নন্দিত হন নি। না হয়েছেন এ-যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী কবি জীবনানন্দ দাশ। কিন্তু তাঁর জন্য, তাঁকে আমি জানতুম বলেই বলতে পারি, খেদ করতে দেখি নি কোনোদিন। বরঞ্চ যাঁদের কাছে তিনি শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন, তাঁরা মুষ্টিমেয় হলেও, তাঁদের নিয়েই তিনি খুশি থেকেছেন। তিনি নিজেই বলতেন: খৃষ্টান পাদরীরা যেমন জনতার হাজার হাজার বর্গমাইলের দিকে তাকিয়ে বাইবেল বিতরণ করেন শ্রেষ্ঠ কাব্য সে-রকম ভাবে বিতরিত হবার জিনিস নয়।—

কথাটি অবশ্য তাঁর নিজের কবিতা সম্বন্ধেই তিনি বলেন নি।

রাজনীতির জগঝম্প তাঁর কানের কাছে কাছে বাজিয়ে বাজিয়ে তাঁকে এতো বিব্রত করা হয়েছিলো যে সম্প্রতি তাঁর কবিতায় তার ছাপ এসে পড়ছিলো। কিন্তু যতোদূর জানি তা তাঁর কাব্য-ধারাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। সেদিন পশ্চিম বাংলা কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে সম্মানিত করেছে—তাঁরো এহেন সম্মানের প্রত্যাশা আমরা করছিলাম।[৩] মনে পড়ে বুদ্ধদেববাবু একদা বলেছিলেন যে সাম্প্রতিক কালের কবিযশঃলিপ্সুরা জীবনানন্দের আশ্চর্য রকম অনুকরণ

করেন। এতো অনুকারক আর কোনো আধুনিক কবির ভাগ্যে ঘটে নি। কথাটা অতি সত্য। সাম্প্রতিক কালের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দকে অনুকরণের প্রাবল্য খুবই বেশি। সেই কারণে যতো তাঁর দান গ্রহণ করে আমরা নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি—ততোই তাঁকে আড়ালে রেখেছি—পাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠায় বাধা ঘটে। আর তাঁকে অস্বীকার করেছেন সংস্কারবদ্ধ সমালোচকেরা।

তবু 'জীবনানন্দ দাশ' স্বনামখ্যাত হয়ে রইবেন। তাঁরই কথায় বলি : সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। তিনি তাদের একজন। অসাধারণ একজন।

আজ তাঁর এই কবিতাটি আমাব বিশেষভাবে মনে পড়ছে :

কোনোদিন নগরীর শীতের প্রথম কুয়াশায়
কোনোদিন হেমন্তের শালিখের রঙে ম্লান মাঠে
হয়তো বা চৈত্রের বাতাসে
চিন্তার সংবেগ এসে মানুষের প্রাণে হাত রাখে,
তাহাকে থামায়ে রাখে।
সে চিন্তার প্রাণ
সাম্রাজ্যের উত্থানের পতনের বিবর্ণ সন্তান
হয়েও যা কিছু শুভ্র রয়ে গেছে আজ—
সেই সোম-সুপর্ণের থেকে এই সূর্যের আকাশে—
সেই রকম জীবনের উত্তরাধিকার নিয়ে আসে।
কোথায়ও রৌদ্রের নাম—
অন্নের নারীর নাম ভালো করে বুঝে নিতে গেলে
নিয়মের নিগড়ের হাত এসে কেঁদে
মানুষকে যে আবেগে যতদিন বেঁধে
রেখে দেয়,

যতদিন আকাশকে জীবনের নীল মরুভূমি মনে হয়,
যতদিন শূন্যতায় ষোলো কলা পূর্ণ হয়ে—তবে
বন্দরে সৌধের উর্ধ্বে চাঁদের পরিধি মনে হবে—
ততদিন পৃথিবীর কবি আমি—অকবির অবলেশ আমি
ভয় পেয়ে দেখি—সূর্য ওঠে ;
ভয় পেয়ে দেখি—অস্তগামী।
যে সমাজ নেই তবু রয়ে গেছে যেখানে কায়েমী
মরুকে নদীর মত মনে ভেবে অনুপম সাঁকো
আজীবন গড়ে তবু আমাদের প্রাণে
প্রীতি নেই—প্রেম আসে না'ক।
কোথায়ও নিয়তি-হীন নিত্য নরনারীদের খুঁজে
ইতিহাস হয়তো ক্রান্তির শব্দ শোনে ; পিছে টানে ;
অনন্ত গণনাকাল সৃষ্টি ক'রে চলে ;
কেবলই ব্যক্তির মৃত্যু গণনা-বিহীন হয়ে পড়ে থাকে জেনে নিয়ে—তবে
তাহাদের দলে ভিড়ে কিছু নেই—তবু
সেই মহাবাহিনীর মতো হতে হবে ?
সংকল্পের সকল সময়
শূন্য মনে হয়।
তবুও তো ভোর আসে—হঠাৎ উৎসের মতো, আন্তরিক ভাবে,
জীবনধারণ ছেপে নয়,—তবু
জীবনের মতন প্রভাবে,
মরুর বালির চেয়ে মিল মনে হয়
বালিছুট সূর্যের বিস্ময়।
মহীয়ান কিছু এই শতাব্দীতে আছে—আরো এসে যেতে পারে :

মহান সাগর নগর গ্রাম নিরুপম নদী,
যদিও কাহারো প্রাণে আজ রাতে স্বাভাবিক মানুষের মতো ঘুম নেই,
তবু এই দ্বীপ, দেশ, ভয়, অভিসন্ধানের অন্ধকারে ঘুরে
সসাগরা পৃথিবীর আজ এই মরণের কালিমাকে ক্ষমা করা যাবে ;
অনুভব করা যাবে স্মরণের পথ ধরে চলে :
কাজ ক'রে ভুল হ'লে, রক্ত হ'লে মানুষের অপরাধ ম্যামথের নয়
কত শত রূপান্তর ভেঙে জয়-জয়ন্তীর সূর্য পেতে হলে।

॥ ঢাকাতে জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুতে শোকসভায় পঠিত ॥

॥ ১. প্রবন্ধে উদ্ধৃত এই পংক্তিটি কোন্ কবিতা থেকে নেওয়া লেখক তা বলেন নি ; পংক্তিটি যে সঠিক উদ্ধৃতি, তা-ও লেখক স্পষ্টত স্বীকার করেন নি, দেখা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, এই রকম একটি অংশ 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের 'আদিম দেবতারা' কবিতায় রয়েছে :

পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ ?
স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত--ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে
ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—
আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা হো হো ক'রে হেসে উঠল :
'ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে শূয়োরের মাংস হয়ে যায় ?'

২. সঠিক উদ্ধৃতিতে পংক্তিগুলো এমনি, 'হাওয়ার রাত' কবিতায় :

মশারীটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌশুমী সমুদ্রের পেটের মত,
...
এক-একবার মনে হচ্ছিল আমার—আধো ঘুমের ভিতর হয়তো—মাথার উপরে
মশারী নেই আমার,
স্বাতী তারার কোল ঘেঁসে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মত উড়ছে সে !

৩ যে কারণেই হোক্, লেখক এখানে ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন ; জীবনানন্দ-র 'বনলতা সেন', সুধীন্দ্রনাথের 'সংবর্ত' যে-বছর নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক পুরস্কৃত হয়, তার আগের বছরেই উক্ত সংস্থা কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছিলো। সঃ মঃ ॥

নির্জনতম কবি ?

স্নেহাকর ভট্টাচার্য

॥ ১ ॥

"নানা মুনির নানা মত থাকাটা দুঃখের বিষয় নয়; নানা মুনির মতের ঐক্যটাই সাহিত্য-সমাজে আসল দুঃখের বিষয়। কেননা সে মত যদি ভুল হয় তাহলে সাহিত্যের ঘোল কড়াই কাণা হয়ে যায়। এবং মুনিদের যে মতিভ্রম হয়—একথা সংস্কৃতেও লেখা আছে।" (প্রমথ চৌধুরী)

জীবনানন্দের কাব্যবিচারে—অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে—মুনিদের ঐকমতের মত দুঃখজনক একটি ঘটনা ঘটে গেছে অনেক আগে। হয়তো বা তাঁকে শ্রীবুদ্ধদেব বসু অনুরাগেই 'নির্জনতম' সংজ্ঞায় অভিহিত করেছেন—কিন্তু, আজ সেই সংজ্ঞা-নির্ধারিত স্বাদ থেকে জীবনানন্দের কাব্যফলের স্বাদ ভিন্নতর।

জীবনানন্দ 'নির্জনতম কবি',—এই কথাটি বহুশ্রুত এবং বহুশ্রুত বলেই লোকমানসে এত পাকাপোক্ত। সংজ্ঞাটির ভঙ্গিটুকু যতখানি অনবদ্য তার যাথার্থ্য সম্পর্কে আমার সন্দেহ ঠিক ততখানি। জীবনানন্দের কাব্য বারবার নতুন করে ভাবায়। তাহলে এতদিনে সংজ্ঞাটির অবলুপ্তিই তো অনিবার্য ছিল। কিন্তু, যেহেতু আমরা নতুনকে বরণ করে নিই ততক্ষণ যতক্ষণ সেই নতুনকে পুরনো চিন্তাধারায় বিচার করতে পারি, চিহ্নিত করতে পারি। যখন আর সেটা সম্ভব হয় না—নতুন করে ভাবতে হয় তখনি উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে, আমরা ভীত হই। জীবনানন্দের কাব্য সম্পর্কে প্রীতি হয়তো আছে তাঁদেরও এবং পরিশ্রমের ভীতিও যে কম নেই একটি কথার পুনরাবৃত্তিই তার প্রমাণ দেবে, অন্য সাক্ষীসাবুদের প্রয়োজন হবে না।

রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতাকে বলেছেন 'চিত্ররূপময়'। কী আশ্চর্য সেই কথাটির সার্থকতা! একটি বিশেষ মানসকে সবার থেকে আলাদা করে—

সত্যরূপে দেখা—চিরকালের মত করে দেখা প্রতিভাত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কথায়; যেন তা জীবনানন্দের অনিন্দ্য রূপলোকের মন্ত্র যাতে তাঁর সব কবিতার বন্ধ দরজা একে একে খুলে যায়। কবিতা বিস্তার আনে, সংজ্ঞা সংহত করে—সবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা করে দেখায়। কিন্তু ভুল সংজ্ঞা সীমিত করে—বিপুলকে তার মর্মে না চেয়ে ভুলের মধ্যে পেতে চায়; গতির মধ্যে যতি আনে।

'নির্জনতম কবি' সংজ্ঞাটি কোন্ অর্থ বহন করে আনে যাতে জীবনানন্দের কবিতার অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখতে পারি? মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কবিতা সম্পর্কে, আর এটি হচ্ছে 'কবি' সম্পর্কে। অবিশ্যি কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যদি প্রযুক্ত হত তাহলে আক্ষেপ না করলেও চলত। কিন্তু এই দিয়েই যখন তাঁর কবিতা বোঝাবার চেষ্টা হয়ে থাকে, আশ্চর্য মূঢ়তায় বিজ্ঞাপনে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হতে থাকে তখন নীরবতা মানে—আর যাই হোক—সততা নয়। বলার মাধুর্যটুকু বাদ দিয়ে জীবনানন্দের রূপলোকে যেতে পথের ইশারা কতখানি পাই, 'নির্জনতম কবি' প্রসঙ্গে সেই কথাটিই আজ বিচার্য।

'নির্জনতম' কথাটি কি জীবনানন্দের সৃষ্টির নিঃসঙ্গতা বোঝাতে প্রযুক্ত? তা যদি হয় তাহলে বলব, আত্মার একাকীত্বে লালিত সৃষ্টির পরম-লগ্নে কোন্ কবি নিঃসঙ্গ নন্? কেননা সৃষ্টির চিরকালের কথা হচ্ছে নির্জনতা, অন্ধকার। নিঃসঙ্গ একাকী হৃদয়ে সেই সৃষ্টির বীজ যখনি ভাবের ও আবেগের আলো-হাওয়ার ডাক শুনল তখনি সৃষ্ট অঙ্কুর এল সবার মাঝখানে—অন্ধকার মাটি ভেদ করে। সেই মুহূর্তে সবাই একা; শুধু জীবনানন্দ নন। আর যদি একটি বিরল মানসের বিস্তারকে তেমনি ভাবেই উপলব্ধি করতে যাই, তাহলে—আমার ভয় হয়—আমরা একই ভুল করব। মহৎ কবি মাত্রেই বিরল মানসের অধিকারী। সবার থেকে আলাদা হবার পথের সব বাধা জয় করেছেন বলেই তো তাঁর নিজের বলার কথাটুকু আর কারুর নয়,

একান্ত ভাবে তাঁরই; শুধু কথাটুকু নয়, ভঙ্গিটুকুও। তাই শেলীর কবিতা ওয়র্ডসওয়ার্থের মত নয়, ওয়র্ডসওয়ার্থের কবিতা বায়রণের মত নয়; রবীন্দ্রনাথের কবিতার মত আর কারুর কবিতাই নয়। তাঁদের কি আমরা বিরল মানসের অধিকারী বলব না? যদি বলি, তবে বিরল মানসের অধিকারী বলে তাঁরা তো সবাই 'নির্জনতম কবি'! জীবনানন্দ নিজেও তার অধিকারী। কেমন করে তবে এই সংজ্ঞা দিয়ে তাঁকে আলাদা করে পেতে পারি।

প্রকৃতিকে ভালোবেসে—শুধু ভালোবেসে নয়—তার মধ্যে নারীর মদির মাদকতা আবিষ্কার করে, তার মধ্যে একা একা ডুবে যেতে চেয়ে, পৃথিবীর বেদনা থেকে মুক্তি কামনা করে, এমন কী পৃথিবীর প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় ভরে গিয়ে জীবনানন্দ নির্জনতাকে আহ্বান করেছেন মাঝে মাঝে:

আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে-গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে চোখ ঘসি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতরে ঘাস হ'য়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।
(ঘাস)

পৃথিবীর বাধা—এই দেহের ব্যাঘাতে
হৃদয়ে বেদনা জমে; স্বপনের হাতে
আমি তাই
আমারে তুলিয়া দিতে চাই। (স্বপ্নের হাতে)

আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়—বেদনায়—আক্রোশে ভ'রে গিয়েছে;
সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি-কোটি শূয়োরের আর্তনাদে
উৎসব সুরু করেছে।
(অন্ধকার)

কিন্তু জীবনানন্দ চিরকাল একটি মনোভাবের, একটি চেতনার বিন্দুতে লগ্ন হয়ে থাকেন নি। মহৎ কবির মত বারবার নিজেকে নতুন ভাবে সৃষ্টি করেছেন, রূপান্তরিত হয়েছেন; নির্জনতার অন্ধকার থেকে স্বজনপ্রিয়তার ও বিশ্বাসের আলোকে ফিরে এসেছেন :

কিংবা যারা এই সব মৃত্যু রোধ করে এক সাহসী পৃথিবী
সুবাতাস সমুজ্জ্বল সমাজ চেয়েছে—
তাদের ও তাদের প্রতিভা প্রেম সংকল্পকে ধন্যবাদ দিয়ে
মানুষকে ধন্যবাদ দিয়ে যেতে হয়।

(এই সব দিনরাত্রি)

মৃত্যু আছে, তবু সেই মৃত্যু ভেদ করে উড়ে যাওয়া,
সূর্য নেই, তবু সেই অয়নের সূর্যের বিশ্বাসে।

(নিবিড়তর)

আজ তবু কণ্ঠে বিষ রেখে মানবতার হৃদয়
স্পষ্ট হতে পারে পরস্পরকে ভালোবেসে।

(আলোপৃথিবী)

পৃথিবীতে এই জন্মলাভ তবু ভালো ;

(পৃথিবীতে এই)

উপরি-উক্ত উদ্ধৃতিগুচ্ছ দুটিতে জীবনানন্দের কবিমানসের রূপান্তরের চিত্র স্পষ্টতর হবে আশা করা যায়। জীবনানন্দের কাব্যে এ বিরোধ নয়, এ তাঁর কবিমানসের নব-নব বোধ।

'সমাজসচেতন কবি', 'ইতিহাসচেতন কবি', 'প্রেমিক কবি' ইত্যাদি সংজ্ঞার স্বল্প-পরিসর ঘরে অনেক কবিই কবিজীবন কোনোমতে কাটিয়ে চলে যান। কিন্তু জীবনানন্দের চেতনার বিস্তার আরো ব্যাপক ছিল, যাতে সমস্ত সংক্ষিপ্ততার কাঠিন্য চূরমার হয়ে যাচ্ছে। তাই তাঁকে কোনো বিশেষ সময়ের কবিতায় পাওয়া যাবে না। তাঁকে পাওয়া যাবে সামগ্রিকতায়, তাঁর সময়ের ফলবান

খণ্ডগুলির সংযোজনায়। তিনি নিজেও বলেছেন, "...সৎ কবির স্বভাব ও শিক্ষা ক্রমেই বদলাচ্ছে;—এই বদলানোটাই প্রাণতত্ত্বের নিয়ম, কবিতারও খুব সম্ভব প্রাণের পরিচায়ক। শিক্ষিত স্বভাবের অব্যয় স্পষ্টতায় আজ যে কবিতা সৃষ্ট হচ্ছে তাঁর, সেটা তাঁর কবিজীবনের একটা পর্যায়ের ভিতর পড়ল; অন্য সব পর্যায় পরে আসছে; পরের পর্যায়গুলো আজকের পর্বের চেয়ে উন্নত বা ভালো হতে পারে, নাও হতে পারে, খারাপও হতে পারে,—কিন্তু বিভিন্ন।" এই ভিন্নতায় জীবনানন্দ অনন্য।

তাই কবিজীবনের শেষপ্রান্তে যখন জীবনানন্দের কবিমানসের উদ্দাম বলিষ্ঠ পাখি 'নির্জনতম কবি' সংজ্ঞার সোনার খাঁচা ভেদ করে অপার আলোকে সবার মাঝখানে ডানা মেলে দিয়েছে তখন তাঁকে কয়েকটি পরিত্যক্ত, বিচ্ছিন্ন ও ধূসর পালকের ঘ্রাণের মধ্যে পাব না, পেতে পারি না। আর বাজারে চলতি মতামতের যারা স্বল্প-মূল্যের ক্রেতা,—তারা জীবনানন্দকে 'নির্জনতম' মেনে নিয়ে বাজারে ভাষাতেই তাঁকে আক্রমণ করেছে; তাদের সামনে থেকে এই লক্ষ্যবিন্দুটি সরিয়ে নিলে যে অপার শূন্যতার হাহাকার উঠবে তা কি কোনোদিন পূর্ণ হবে?

॥ ২ ॥

মহৎ শিল্পীর মধ্য দিয়ে কাল নিজের উদ্দেশ্যটুকু ফুটিয়ে তোলে। দেশ-কাল-সমাজকে আত্মস্থ করেই মহৎ কবি, তাকে বাদ দিয়ে নয়। অবিশ্যি সময়ের সামান্যতম কম্পনটুকু বুকের বীণার মধ্যে ধরে রাখতে হলে তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন সচেতন মনকে গড়ে তোলা প্রয়োজন। জীবনানন্দের সেই মন ছিল। অনেকে, যাঁরা কালকে ফুটিয়ে তুলছেন বলে প্রচারিত তাঁদের কাল আর আসে নি। কবিতা—শুধু কবিতা কেন—যে কোনো শিল্পের মহত্তর পরিণতি সময়ের যান্ত্রিক প্রতিফলনে সম্ভব নয়। কবি বাইরে থেকে উপাদান এনে এক অদৃষ্টপূর্ব মনোময় রূপলোকের নির্মাণপ্রয়াসী। কবি যত বড়ো তাঁর নিজস্ব জগতের পরিধি তত বিস্তৃত।

বহির্জগতের শব্দ-রস-রূপ-গন্ধ ঠিক যেমন আছে কবিতাতেও ঠিক তেমনি থাকবে আজ আর তেমন আশা কেউ করবে না। বাইরের আলো মনের পরকলার মধ্যে বিশ্লিষ্ট হয়ে নিগূঢ় চেতনার যে অংশটুকু আলোকিত করে ভিন্ন দৃশ্যাবলী ফুটিয়ে তুলবে, মনের অতল থেকে তারই একখণ্ড তুলে নিয়ে আসবেন কবি। কবির মনে আলোর এই আপতন-প্রতিফলন অবিশ্যি সাধারণ বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী ঘটে না; এ-তে বস্তু মনোময় হয়ে ওঠে, মন বস্তুরূপ হয়। তাই জীবনানন্দ রিয়ালিষ্ট নন, সুররিয়ালিষ্ট। স্বাভাবিক ভাবেই জীবনানন্দ অন্তর্গূঢ় চেতনার নির্দেশ মেনেছেন, বাইরের বস্তু-পৃথিবীর পুনরাবৃত্তিতে উৎসাহ বোধ করেন নি। অবচেতন, অর্ধচেতন মনের আলো-ছায়া বিলীন পথে চেতনার খণ্ডদ্যুতিকে অনুসরণ করে জীবনানন্দ সুররিয়ালিজমের পথে এসে পড়েছেন। মনের অনুশাসন মানলেই অবিশ্যি কেউ সুররিয়ালিষ্ট হয় না। কেননা সুররিয়ালিজম্ আজ আর শুধু অস্পষ্ট একটি পথ নয়, একটি সুনির্দিষ্ট মতও বটে। সুররিয়ালিজমকে নৈরাশ্যসঞ্জাত বলা যায়। এই নৈরাশ্য শুধু কবির মনের একান্ত নিজস্ব নয়, বাইরের পৃথিবীতেও তার সমর্থন থাকা চাই। অথবা বাইরের পৃথিবীর নিরাশার ঘনিষ্ঠতায় মনের মধ্যে বস্তুর যে স্থানভেদ, প্রকারভেদ কিম্বা গুণগত প্রভেদ দেখা যাবে তাই হবে সুররিয়ালিষ্ট চিত্র। সুররিয়ালিজমের সঙ্গে সামাজিক অবক্ষয়ের এক অদৃশ্য যোগসূত্র রয়ে গেছে। ডালি যিনি সুররিয়ালিষ্ট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা চিত্রকর ছিলেন, তিনি এ-কে বলেছেন, "systematisation of confusion"; কালের ক্লান্তি ও ক্লেদটুকুকে বাঁচিয়ে নয়, তাকে গ্রহণ করে, আত্মস্থ করে ভিন্নতর পটভূমিকায় উপস্থাপন করাও হবে তাঁদের কাজ। চেতনা ও অবচেতনার মধ্যে সব প্রাচীর ভেঙে ফেলে, সেই অন্তর্লোক জয় করে ক্ষয়ের ছবিটি নিয়ে আসতে হবে সেই ক্ষণদ্যুতি উদ্ভাসিত ম্লান জগৎ থেকে। সুররিয়ালিষ্ট ম্যাক্স আর্ণষ্ট-এর কথায়:

"it is rather their aim to break down the barriers both

physical and psychical, between the conscious and the unconscious, between the inner and the outer world, and to create a superreality in which real and unreal meditation and action, conscious and unconscious meet and mingle and dominate the whole of life."

জীবনানন্দের মন কালের ক্লান্তিকে আত্মস্থ করে অবগাহন করেছে চেতনার ছায়াসলিলে, কিন্তু এতখানি সচেতন সুররিয়ালিষ্ট তিনি ছিলেন না।

মহৎ শিল্পের সঙ্গে সময়ের মানসিক জলবায়ুর আত্মীয়তা আছে এবং জীবনানন্দেরও ছিল। তাঁর বিভিন্ন কাব্যপর্যায়ের মধ্যে সুররিয়ালিজম একটি পর্যায় মাত্র হলেও—যা না কি বিশেষ করে 'সাতটি তারার তিমিরে' লালিত—যে চেতনায় এই বোধ জন্ম নেয় তা প্রথম থেকেই তাঁর ছিল। 'ঝরাপালক' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটিতেই এই মনোবীজের সন্ধান পাওয়া যাবে :

আমি কবি,—সেই কবি,—
আকাশে কাতর আঁখি তুলি' হেরি ঝরাপালকের ছবি !

(আমি কবি,—সেই কবি)

প্রায় abstract থেকে বাস্তবের ভয়ঙ্কর অসমঞ্জস মূর্তি পর্যন্ত সুররিয়ালিজমের রাজ্যের বিস্তার। তাই অবচেতন মনের সাঙ্কেতিক ভাষা না জানলে এই দেশের বর্ণপরিচয়ের জ্ঞান লাভ করা কঠিন। তবু প্রতীকি কবিতার চেয়ে সুররিয়ালিষ্ট কবিতায় সময়কে আবিষ্কার করা সহজতর। কেননা একই প্রতীকচিহ্ন যখন ভিন্ন ভিন্ন অর্থের দ্যোতনা বহন করতে পারে, তখন পাঠকের অনবধানতাকে দায়ী করে দায়িত্ব এড়ানো চলে—কাজ চলে না।

সন্ধ্যার নদীর জলে এক ভিড় হাঁস অই—একা ;
এখানে পেল না কিছু ; করুণ পাখায়
তাই তারা চলে' যায় শাদা, নিঃসহায়।
মূল সারসের সাথে হ'ল মুখ দেখা।

(একটি কবিতা)

এখানে যে মূল সারস কবির মৃত হৃদয়ের প্রতীক সে কি দেশ? কাল? মানব? পৃথিবী? সমাজ? প্রতীক যে কোনো একটির হতে পারে, সবগুলিরও হতে পারে, তাতে অর্থের এমন কিছু বৈষম্য হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু,

তিনবার তিন গুণে নয় হয় পৃথিবীর পথে ;
এরা তবু নয়জন মায়াবীর মত জাদুবলে।

(হাঁস)

এই ন'টি হাঁস কেন যে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমে নয় হয়েছে তা খুব স্পষ্ট নয়। Abstract-এর দিকে খুব বেশি ঝুঁকে না পড়লে সুররিয়ালিষ্ট কবিতা লেখকের উদ্দেশ্য পাঠকের মনে পৌঁছে দিতে পারে :

নিদ্রায় আসক্ত হতে গিয়ে তবু বেদনায় জেগে ওঠে পরাস্ত নাবিক ;—

এবং,

মোমের আলোকগুলো র'য়েছে পিছনে প'ড়ে অমায়িক সঙ্কেতের মত ;
তারাও সৈকত। তবু তৃপ্তি নেই। আরো দূর চক্রবাল হৃদয়ে পাবার
প্রয়োজন র'য়ে গেছে,—

(নাবিক)

এখানে যে পরাস্ত নাবিক নিদ্রাহীন বেদনার মধ্যে আরো এক সমুদ্রের তীর খোঁজে আমরা সবাই সেই বেদনার অংশীদার বলে তাকে সহজেই চিনতে পারি, উদ্দেশ্যকে অনুভব করতে পারি।

সারাদিন দূর থেকে ধোঁয়া রৌদ্রে রিরংসায় সে উনপঞ্চাশ
বাতাস তবুও বয়—উদীচীর বিকীর্ণ বাতাস ;
নারকেলকুঞ্জবনে শাদা শাদা ঘরগুলো ঠাণ্ডা ক'রে রাখে,
লাল কাঁকরের পথ—রক্তিম গির্জার মুণ্ড দেখা যায় সবুজের ফাঁকে :

(নিরঙ্কুশ)

নগরীর মহৎ রাত্রির সঙ্গে অন্যত্র লিবিয়ার হিংস্র জন্তুসমাকুল অরণ্যের তুলনা এবং এই উদ্ধৃতিটির 'রক্তিম গির্জার মুণ্ড' বাক্যাংশটিতে 'মুণ্ড' কথাটির প্রয়োগ অন্তঃসার-শূন্যতার উজ্জ্বলতা আর ঔপনিবেশিক দেশে গির্জার কপট মহিমাকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করেছে।

সুররিয়ালিজম্‌কে এতক্ষণ শুধু অবক্ষয় এবং নিরাশার সঙ্গে যুক্ত করেছি। কিন্তু, জীবনানন্দ সনাতন নিয়মে আস্থা স্থাপন করতে গিয়ে সেই গণ্ডী লঙ্ঘন না করেও লিখেছেন :

কেবল কাস্তের শব্দ পৃথিবীর কামানকে ভুলে
করুণ, নিরীহ, নিরাশ্রয়।
আর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।
(ক্ষেতে প্রান্তরে)

এই বোধ ছিল বলেই নির্জনতা জীবনানন্দকে ধরে রাখতে পারে নি কোনোদিন। অথচ সুররিয়ালিষ্ট বলে তাঁর নির্জনতম হওয়ারই কথা ছিল। সব সময়েই সময় তার ক্ষীণতম তরঙ্গের স্পন্দন রেখেছে তাঁর বুকে। তাই তাঁর কাব্যে সময় ও সমাজের, মানুষের ভাষা শুনি যতখানি ততখানি আর কারো কাব্যে নয়।

জীবনানন্দের কবিমানস যেন কামান গর্জনেরও ওপরের অনাবিল আকাশে অমল মরাল। এই সৌরকরময় প্রোজ্জ্বলতা তাঁর শেষ অর্ঘের উপহার এনেছে।

মানুষের মন থেকে কাটবে না যদিও সব গ্লানি
তবু আলো ঝলকাবে অন্য এক সূর্যের শপথে।
(আলো পৃথিবী)

সমাজসচেতনতা, ইতিহাসচেতনা ইত্যাদি খণ্ড খণ্ড চেতনাবৃত্তের পারে জীবনানন্দ উজ্জীবিত হয়েছেন যে মহাপৃথিবীর আলোময়তায় তার নাম সৌর চেতনা। তাই জীবনানন্দ মানে আর ধূসর নির্জনতা নয়, জীবনানন্দ মানে আলোকিত স্বজনপ্রিয়তা।

শেষের ক'দিন

সমর চক্রবর্তী

প্রথমেই মনে পড়ছে কয়েক মাস আগের একটি সন্ধ্যেবেলার কথা। ভূমেন, আমি ও স্নেহাকর তাঁর বাড়ীতে শরৎ-সংখ্যা 'ময়ূখে'র জন্যে কবিতা আনতে গিয়েছিলাম। কড়া নাড়বার প্রয়োজন অবশ্য অনেকদিন আগেই শেষ হয়েছে। তিন জন তাঁর ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। তিনি তখন শুয়ে শুয়ে কি একটা বই পড়ছিলেন। আমাদের শব্দ পেয়ে বিছানায় উঠে বসে ভেতরে আসতে বল্লেন ইসারায়। কোমল স্পর্শের মত শরীরে অনুভব করলাম জিজ্ঞাসু চোখের দৃষ্টি। ঘরটা ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, একটু বেশিরকম ভাবেই গোছালো। যত দূর মনে পড়ে বইয়ের কোন শেল্‌ফ্‌ ছিল না। মেঝের উপর খবরের কাগজ পেতে তার উপর বইগুলো ছিল, অসংখ্য বই, কিন্তু এলোমেলো ভাবে নয়। ফ্যাকাশে লাল রঙের দেয়াল, তাতে কোন ছবি ছিল বলে মনে পড়ে না। পায়ের দিকে একটা ক্যালেণ্ডার, কচি ডালে কয়েকটি পাটল পাতা, দুটি পাখি মুখোমুখি বসে আছে। খাট থেকে মেঝেয় নেমে এলেন, চোখ দুটো ঈষৎ রক্তাভ, একটু বে-টাল, মৃদু কৌতুক উঁকিঝুকি দিচ্ছে মাঝে মাঝে। অনেক কথার পর আসল কথা, আর আসল কথা মানেই তো কবিতা। সব কথা মনে করতে পারছি নে, কি একটা কথায় তিনি বলেছিলেন, 'গালাগালি করলে ভয় পাওয়ার কি আছে, আমি কি কম গালাগালি খেয়েছি। ও-সবে ঘাবড়ে যেয়ো না। আর আমার জন্যে কিন্তু একটা বাড়ী দেখবে।' কণ্ঠে অন্তরঙ্গতার ললিত আলাপ। জীবিত অবস্থায় প্রকাশিত সর্বশেষ কবিতাটি সেদিনই তিনি দিয়েছিলেন।

এমন একটি দুর্ঘটনার জন্যে আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। দুর্ঘটনার দিনই খবর পেয়েছিলাম একজন বন্ধুর কাছ থেকে। কিন্তু ততটা গুরুত্ব দেই নি।

তবুও ভূমেন যখন মেডিক্যাল কলেজে পড়ে, আগে তার কাছেই গেলাম, কারণ মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গিয়ে থাকলে, দেখাশোনার সুবিধে হবে। ইমারজেন্সিতে খোঁজ নিয়ে জানলাম সেখানে তাঁকে আনা হয় নি। সেদিন কি তার পরের দিন রাত্রিতে এসে ভূমেন জানাল যে, 'পূর্বাশা'-অফিস থেকে খবর এসেছে—কবি জীবনানন্দ গুরুতর ভাবে আহত হয়ে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে আছেন, আমরা যেন তাঁর সেবা শুশ্রূষার ব্যাপারে সাহায্য করি।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল থেকে 'ময়ূখে'র অফিস বেশ কাছেই। আমরা ঠিক করে নিলাম এখান থেকেই কে কখন সেবা করতে যাবে তা ঠিক করব। ভূমেনের ওপর ভার পড়ল ডাক্তারি-পড়া ছাত্রের যোগাড় করা। এ প্রসঙ্গে দিলীপ মজুমদারের নাম আগে উল্লেখ করতে হয়। এর আগে তাঁর কথায় কবি ও কবিতার ওপর কিঞ্চিৎ কৃত্রিম ব্যঙ্গের আভাষ পাওয়া যেত। কিন্তু আশ্চর্য, ভূমেন যখন তাঁকে রাত্রি জেগে সেবা করার জন্যে অনুরোধ করল, তখন তিনি সুহৃদের মত এগিয়ে এসে রাত্রির পর রাত্রি বিনিদ্র থেকে সেবা করেছেন। শেষের দিনে সুজিত ধর-ও সেবায় কম আন্তরিকতার পরিচয় দেন নি। মনে করেছিলাম কবিকে নিশ্চয়ই অন্ততঃ কেবিনে রাখা হয়েছে, কিন্তু তা হয় নি। অবশ্য তার জন্যে কোন অনুশোচনা করা মূর্খতা। জীবিত অবস্থায় না খেয়ে মরে গেলেও, বাংলাদেশের কবিদের একমাত্র সান্ত্বনা, বোধ হয়, মরলে তাঁর চিতায় মঠ দেওয়া হবে, এই আশাটুকু। সৌভাগ্য এই, মৃত্যুর পর কবিকে তা আর দেখতে হয় না, তাঁর অনেক আশার মত শেষ আশাটিও কি নিদারুণ ভাবে ব্যর্থ! শুনেছিলাম বাংলাদেশের মুখ্য মন্ত্রী তাঁকে একবার দেখতে এসেছিলেন। তার পরেই সাদা কাপড়ের আবরণ দিয়ে যত্ন নেওয়ার একটি মিথ্যে কুয়াসার সৃষ্টি করা হয়েছিল। যদিও এর আগেই, বোধ হয়, অধিক যত্ন নেওয়ার ফলে তাঁর বুকে ঠাণ্ডা বসে গিয়েছিল, যার জন্যে মৃত্যু আরেকটি প্রাণ উপহার পেল। একই ঘরে পুলিশ কেসের রুগী আর কবি জীবনানন্দ! তারপর আবার প্রহরারত বেহারী শাস্ত্রীর খৈনী টিপতে টিপতে

মৃদু স্বরে সম্মিলিত ঐকতান সঙ্গীত! বেদনায় আমরা এতই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলাম যে, এই সমস্ত ছোট খাট বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার মত মানসিক অবস্থা আমাদের ছিল না। সেই গাঢ় বেদনার উপশমের জন্যে আমরা মৃত্যুর আগেই শোকোচ্ছ্বাস লিখতে বসে গেছি। কিম্বা এমন একটি বক্তৃতার খসড়া করতে বসে গেছি যার জন্যে স্মৃতি-বাসর থেকে নিমন্ত্রিত অতিথিকে মুখ কালো করে চলে যেতে হয়। সিষ্টার শান্তি দেবী ব্যর্থ হলেন তাঁকে আন্তরিক ভাবে সেবা করে। তাঁর সেবা, তাঁর অশ্রু, তাঁর বিনিদ্র রাত্রির প্রতীক্ষা, কিছুই রক্ষা করতে পারল না কবি জীবনানন্দের প্রাণ। পরে, না হয় শোকসভার শেষে আমরা দীর্ঘ বক্তৃতার উপসংহার টানতে পারব এই কথা বলে—'tis Death is dead, not he।

ভোর হয়ে এসেছে। আকাশের রঙ জীবনানন্দের পায়ের ব্যাণ্ডেজের মত কালচে লাল। নষ্ট, মৃত চাঁদকে কে যেন দিনের সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাচ্ছে। শুকতারার প্রদীপ জলছে কার হাতে? সারারাত অসহ্য আর্ত চীৎকারের পর অসীম ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল এগারো নম্বর বেডের আগুনে-পোড়া লোকটি। বিছানার একপাশে দাঁড়িয়ে কবির দিকে তাকিয়ে ছিলেন দিলীপবাবু। হঠাৎ চোখের পাতা দুটো একটু কেঁপে কেঁপে উঠে খুলে গেল, এক আর্ত অসহায় দৃষ্টি। জিজ্ঞেস করলেন: 'এখন কটা বাজে?'

'ভোর পাঁচটা।'

চোখের পাতা দুটোকে বন্ধ করে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন: 'লিখে রাখ আজকের তারিখটিকে, আজ থেকে গত এক বৎসর খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। এখন ভোর না সন্ধ্যে? আমি কি দেখতে পাচ্ছি জান? 'বনলতা সেন'-এর পাণ্ডুলিপির রঙ।'

আরো একদিন; সেদিন কিছুটা ভাল ছিলেন। ডাক্তারেরা আশা করেছিলেন, আর কিছুদিন যদি এ-রকম অবস্থা থাকে তবে বেঁচে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা। সেই দিন রাত বারটা-একটার মত হবে, কবি মাঝে মাঝে চোখ মেলছিলেন,

ক্লান্ত, উদাস। মাঝে মাঝে হাত টেনে নিয়ে চাপ দিচ্ছিলেন, কখনো হাতটাকে টেনে নিচ্ছেন গালের ওপর। আমাদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন: 'আচ্ছা, আমাকে তে'তলায় নিয়ে যেতে পার। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কবিতা বলবো, আমার যে রেডিয়ো প্রোগ্রাম আছে।'

এর আগে দু'দিন পর পর নিদ্রাহীন রাত জেগেছে ভূমেন। সেই রাত সুজিত বাবুর। দিলীপবাবুর থাকার কথা নয়; অথচ কখন যে আশ্চর্য এমনও হয়—দিলীপবাবু ছুটে চলে এসেছেন। মৃত্যু তার সব আয়োজন পূর্ণ করে এনেছে, এবং প্রগাঢ় শূন্যতা, এক অন্তহীন মুখর মৌনতা। আমাদের দিদি সুচরিতা দাশ—জীবনানন্দের ছোট বোন—অসহ্য বেদনার ভারে অবসন্ন, ক্লান্ত; তাকিয়ে আছেন অনিমেষ দৃষ্টিতে যেন সব শেষের যে কথাটি থরো-থরো করে কেঁপে উঠবে কবির চোখে তাকে ধরে রাখবেন হৃদয়ের অন্তর্লোকে। 'এই সময় ভূমেন যদি থাকত!', বলল স্নেহাকর। কিন্তু খবর দেবে কে? এই চরম মুহূর্তের পর বেদনাটুকু বুক ভরে নিতে হবে বলে সবাই উৎকণ্ঠিত! যে যাবে তার তো এই বেদনার সান্ত্বনা না-ও থাকতে পারে। তবুও দেখা মেলে একটি বন্ধুর। সে প্রতাপ গোস্বামী—'ময়ূখে'র সুখদুঃখের সহচর। 'ময়ূখে'র যারা কাছে তারা কেউই দূর নয় তার হৃদয় থেকে। তাই ডেকে নিতে হয় নি, সে নিজেই প্রতিটি রাতে এসেছে সময় মত। কেউ যাবে না তাই প্রতাপ ছুটে গেল কলেজ ষ্ট্রীটে, ভূমেনের কাছে।

সন্ধ্যেবেলায় যাদের দেখেছি তাদের মধ্যে এখন নেই অনেকেই। শুধু একটি নিবিড় ছোট ভিড় রয়ে গেছে দরজায়; সবাই মিলে যেন একটি উৎকণ্ঠার শিখা। এখন শুধু অন্তহীন অন্ধকার লগ্নের প্রতীক্ষায় থাকা। মনে মনে বলি, শেষহীন হোক এই অতন্দ্র জাগার ব্যথার কান্নার রাত্রি। কটা বেজেছে বুঝতে পারি না—জানি না কখন যে অন্তহীন প্রেমে কবি নেমে পড়েছেন নীরবতার প্রগাঢ়তায়। শুধু দেখলাম শুধু শুনলাম সিষ্টার শান্তি দেবীর চোখে অশ্রুর অশ্রুত ধ্বনি পবিত্র ঘণ্টার মত কেঁপে কেঁপে উঠছে। এগারটা পঁয়ত্রিশ। সবাই স্তব্ধ। কান্না

চাপবার একটি ব্যর্থ প্রয়াস। দিদি কাঁদছেন। চিরদিনের মত শেষ হয়ে গেল আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কবিতা বলার সাধ। পাণ্ডুলিপির রঙ মুছে গেল জীবনানন্দের চোখ থেকে। কথা বলে না কেউ। এক মহাসমুদ্রের সঙ্গমে তীর্থযাত্রীর মত সবাই প্রার্থনায় অবনত। সিঁড়িতে দ্রুত পদক্ষেপ। হাওয়ায় আকুলতার আর্তনাদের স্পন্দন। স্তব্ধতা দুলে দুলে ওঠে। আমরা তাকালাম। ভূপেন আর প্রতাপ।

সমস্ত ব্যবস্থা করে কবিকে নিয়ে যেতে অনেক রাত হয়ে গেল। মোটরের মধ্যে কবিকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। 'পূর্বাশা'র সত্যপ্রসন্ন দত্ত ও 'চতুরঙ্গে'র মানিক মুখোপাধ্যায় চলে গেলেন। ড্রাইভার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। এলগিন রোড ধরে ল্যান্সডাউনে গিয়ে গাড়ী পড়েছে। গভীর রাত্রি। মহানগরী ঘুমে অচেতন। সারি সারি দেবদারু আর কৃষ্ণচূড়া গাছ চোখ মেলে দেখছে এই মহাযাত্রা। আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মত এই রাত। মেঘের স্তূপ আকাশের বুক চেপে ধরেছে। গ্যাসের আলো মিট্‌মিট করে জ্বলে, সৃষ্টি করেছে এক স্বপ্নময় কুহক। বিশাল রাস্তা মৃত অজগরের মত শুয়ে আছে। গাড়ী চলেছে এর ওপর দিয়ে। নিবিড় নির্জন রাস্তা। কাস্তের মত বাঁকা চাঁদ। সর্বাঙ্গে বৈধব্যের শ্বেত আভরণ। অপরিসীম ব্যথায় গাছের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। আকাশে অসংখ্য মৃত তারাদের মিছিল। যে নক্ষত্রেরা হাজার হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে। মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে যেতে যেতে স্বর্গপথযাত্রী নক্ষত্রের মুখর ভাষা মূক সঙ্গীতের রাগিনীর মত নিবিড় নীরবতায় প্রবহমান। সময়ের ক্লেদাক্ত নরককুণ্ডে ফেলে আমরা তোমাকে হনন করেছি—বরণ করবো তোমাকে—হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রঙের সূর্যের নরম শরীরে, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে, কিম্বা ভিজে মেঘের দুপুরে ধান-সিড়ি নদীটির পাশে। শান্ততা ও নীরবতার ওড়নাঢাকা রাস্তা শেষ হয়েছে। গাড়ী এসে বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। দোতলার একটা ঘরে কবিকে শুইয়ে রেখে আমরা চলে এলাম।

পরদিন সকাল বেলায় গিয়েছি। কবির কবি-বন্ধুরা সবাই এসেছেন। 'কল্লোল'-যুগে দুর্বার প্রাণ-প্রাচুর্যে যিনি ছিলেন উচ্ছল, সুখদুঃখের দোলায় যিনি দীর্ঘদিন জীবনানন্দের সঙ্গে এক পথে হেঁটেছেন, আজকের এই শোকশুভ্র শেষের দিনেও সেই বান্ধব উপস্থিত। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবি গভীর নিদ্রার কোলে সমাহিত। 'অমাবস্যা'র কবি অচিন্ত্যকুমারের অন্তরও বুঝি অন্তহীন অমাবস্যায় আচ্ছন্ন। বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও আরো অনেকে এসেছেন, আর এসেছেন সজনীকান্ত, মৃত্যুতে প্রেমের সেতুবন্ধন হয়ে গেল। জীবনানন্দের সঙ্গে সজনীকান্ত। তরুণ-কবিরা জমে আছেন সিঁড়িতে। বেদনায় এলোমেলো। সবার মুখ বেদনায় পাণ্ডুর। পরিচিত-অপরিচিত অনেকে চোখের জল চেপে রাখতে পারলেন না। একটি শোকশ্রীময়ী মেয়ে অস্থির পায়ে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে, সমস্ত পৃথিবীর কান্না তার দুই চোখে জমা, কিন্তু গলে পড়ল না এক ফোঁটা।

উত্তরসূরীরা খাট তোলার সঙ্গে সঙ্গেই যে যার বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চললেন আমাদের সঙ্গে শ্মশানে। চিতার ওপর অনেকে ছড়িয়ে দিল ফুলের মালা, কেউ জ্বালালে ধূপকাঠি। সুদূর বজ্‌বজ্‌ থেকে ছুটে এসেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। জনগণের কবি শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ করতে এসেছেন হেমন্তের কবির শেষের দিনে।

সম্পাদকীয়

নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ করার ব্যাপারে আমাদের মতো অতি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যে কতো অসহায় তা ক্রমেই মর্মান্তিকভাবে উপলব্ধি করতে হচ্ছে বলে আজ আর প্রতিশ্রুতি দেবার মতো স্থির বিশ্বাস সঞ্চয় করাও শক্ত কাজ। গত সংখ্যায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো যে, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভবপর 'জীবনানন্দ-স্মৃতি সংখ্যা' প্রকাশিত করবো আমরা, এবং প্রকাশকাল বিলম্বিত করারও পর্যাপ্ত সময় একটা বেঁধে দেওয়ার মতো দুঃসাহস আমরা তখন পোষণ করতে পেরেছিলাম ; প্রমাণত বলা হয়েছিলো যে, 'শীত সংখ্যা'টি ঈপ্সিত 'স্মরণ সংখ্যা' হিসেবে বেরোবে। যখন দেখা গেলো, যথেষ্ট ঐকান্তিকতা ও আন্তরিকতা ও পরিশ্রম সত্বেও পত্রিকা-প্রকাশ-ব্যাপারে সম্পর্কান্বিত অন্যান্য বৈষয়িক দিক থেকে অসহযোগিতা ও বিরূপতা পেতে-পেতে কোনো রকমেই আর বাঞ্ছিত সময়ের মধ্যে কাগজ বার করা যাচ্ছে না, কার্যকরী হিসেবে সে-সব দিকের প্রতিকূলতা এতো প্রধান যেহেতু যে, তাদের কাছে পরাভূত না-হয়ে আমাদের মতো ক্ষীণ সামর্থ্যের উদ্দীপনার উপায় নেই, তখন শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম সংখ্যা একত্র করে দিয়ে তবু-যা-হোক একটা মাঝামাঝি আপোষ করার চেষ্টা করেও আমরা যথাসাময়িক হতে পারলাম না। এ-জন্যে অন্য কোনো সমর্থতর পত্রিকা হয়তো লজ্জা প্রকাশ করতো, কিন্তু আমরা অক্ষমতাজনিত গাঢ়তর দুঃখই শুধু প্রকাশ করতে পারি, লজ্জিত হবো না, কেন-না তেমন কোনো ত্রুটি অন্তত আমাদের সাধ্যের দিক থেকে ঘটে নি বিলম্বিত পত্রিকা প্রকাশে যার জন্যে লজ্জিত হতে হয়। পত্রিকা যদিও দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর এমন সময় বেরোলো যখন বর্ষা সংখ্যা হাতে পাওয়ার কথা ছিলো, তবুও এ-সংখ্যাটি 'শীত-বসন্ত-গ্রীষ্ম মিলিত সংখ্যা' হিসেবেই গ্রহণীয় ; কোনো প্রতিশ্রুতি না দিয়ে, কারণ তার ওপর নির্ভর করতে বলার

মতো দৃঢ়তা আজ আর নিজেদেরই পক্ষে সংগ্রহ করে ওঠা দুরূহ কার্য, বলতে পারি যে, এর পরে এমন ভাবে হয়তো বর্ষা সংখ্যাটি প্রকাশিত হবে যে, আগামী শারদীয়া সংখ্যাটি মহালয়ার আগেই আপনাদের হাতে পৌঁছতে পারবে। এই সংখ্যাটি বেশ বড়ো হয়েই প্রকাশিত হলো, এবং অন্যান্য দিকেও দেখা যাবে যে, সর্বথা সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করতে যথাসাধ্য সপ্রচেষ্ট হতে চেয়েছি আমরা ; তার ফলে স্বাভাবিক কারণেই পূর্ব সংখ্যায় ঘোষিত মূল্যের চাইতে এ-সংখ্যার মূল্য কিঞ্চিৎ বাড়াতে হয়েছে ; 'ময়ূখে'র বন্ধুবৃন্দের তাতে আপত্তির কারণ ঘটবে না, আশা করি।

* *

সেই পুরোনো কথাটাই আবার উঠবে কি-না জানি নে যে, এতো অসহনীয় বিলম্বে এই স্মৃতি-সংখ্যা বার করবার প্রয়োজনীয়তা কতোটুকু। স্মৃতি-সংখ্যার প্রয়োজনীয়তা—কথাটাই হয়তো যথেষ্ট স্পষ্ট নয়, অন্তত আমাদের কাছে নয়, কেন-না গত সংখ্যায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই প্রসঙ্গে যে-সব উত্তর দেবার চেষ্টা ছিলো, সে-গুলো এখনই বাসি মনে করার কারণ আমাদের নেই। জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে অল্প কয়েকখানি স্মৃতি-সংখ্যা বেরিয়েছে, ভালো করেই বেরিয়েছে, তার পরেও, অনেকের মনে হতে পারে, এখানার দরকার ছিলো। ছিলো এই জন্যে যে, বাংলার তরুণতর কবিগোষ্ঠীর হাতে কাগজ যেহেতু একাধিক রয়েছে, আধুনিক কাব্যধারার প্রধানতম এবং সম্ভবত মহত্তম কবি-প্রতিভার অবসানে তাই, তাঁদের উপর ঘটনাটার প্রতিক্রিয়া কতোটা গভীর হয়েছে, তার একটা বাহ্য অভিব্যক্তিও লোকে দেখতে চাইতে পারে. বলে, একাধিক তরুণতর কবিতা-সঙ্কলন বা কবিতা-পত্রের, পাঁচমিশেলি সাহিত্য-পত্রগুলির কথা ছেড়ে দিলেও, ব্যবহারে সাধারণ পাঠক হতচকিত হতে পারে, তাঁদের সংসার-নিরপেক্ষ পরম-ঈশ্বরবোধান্বেষী নির্বিকারতা দেখে, এই ব্যাপারে। একখানি অন্তত তরুণদের কবিতা-পত্রিকা অনেকের চাইতেই বেশি আন্তরিক হলেও, কেউ-কেউ এক পাতা বা আট-দশ পংক্তি সম্পাদকীয়ে যথাকর্তব্য সমাধা করেছেন বলে, মনে হয়, এতো

দেরিতে বেরুলেও এই স্মৃতি-সংখ্যার প্রয়োজনীয়তা, অন্য সব যুক্তিতর্কের কথা মূল্যহীন মনে করলেও, তরুণতর কাব্য-প্রচেষ্টাদের স্বার্থেই অনেক মূল্যবান, কেন-না, শাদা বাংলায় বললে, সাধারণ পাঠকমহল স্মৃতি-সংখ্যা না-হলেও, নয়ই-বা কেন, স্মৃতি-সংখ্যাই আরো কয়েকখানি অন্তত আশা করেছিলো। এই সব ব্যাপারে 'ময়ূখে'র স্মৃতি-সংখ্যাটির উপযোগিতা বিলম্বহেতু কিঞ্চিৎ অসাময়িক হলেও কমে যায় নি। আধুনিক কবিতা সর্বব্যাপক হলেও এখনো তার স্থবির বিপক্ষ দল কুটিলতা নিয়ে হিংস্র হয়ে নেই, এমন নয়; এদের পরিচালিত পত্রিকার সংখ্যাবাহুল্য দেখলেই তা বোঝা যাবে; আর মাঝামাঝি যে-সব পত্রিকা চলছে বাজারে, আধুনিক সাহিত্যের বলে লোকে যাদের ভুল বুঝে থাকে, তারাও আধুনিক নয় পুরোপুরি, দু'দলের পাঠকই হাতে রাখার জন্যে দু'ধারার সাহিত্যের এক কিম্ভূত রসায়ন হতে গিয়ে পঞ্জিকার মতো বৃহদাকারে অসাধু;—এই পটভূমিকায় নিছক আধুনিক সাহিত্যেরই পত্রিকা যে অল্প কয়েকখানা, বিশেষ করে তরুণদের পরিচালিত পত্রিকা, তাদের যে আধুনিক সাহিত্যধারার যে-কোনো প্রধান ঘটনা সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন থাকতে হয়, এ-কথা বলা বাহুল্য। জীবনানন্দের মৃত্যু নিশ্চয়ই একটা অসাধারণ দুঃখাবহ ঘটনা। কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে নমো-নমো করে দায় সারা হলো, একটা বিস্তীর্ণ শোকসভা পর্যন্ত হলো না, হলো না এমন দেশে যেখানে কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর পশ্চিমি কবিকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে, অন্তর্কলকাঠির কোন্ গূঢ় কার্য কারণে, কে জানে, বাংলা দেশের তরুণতর কোনো-কোনো সাহিত্য-সেবী-গোষ্ঠী লজ্জাকর আড়ম্বরের সঙ্গে সভা-সমিতির আয়োজন করে থাকেন; হাজারটা অভিনন্দন-সভা হয়ে থাকে যেখানে কোনো-কোনো অক্ষম উপন্যাস যদি সরকারী পুরস্কার পায় তবে;—এ-সব দুঃখিত হওয়ার মতো ঘটনা। আশা করা যাচ্ছে, জীবনানন্দের মৃত্যুতে যে আমাদের সাহিত্যজগতে বিপর্যস্ত বোধ করার মতো কোনো ব্যাপার ঘটেছে, তা আমরা অচিরে বিস্মৃত হবো, বা স্বীকার করবো না আর, কিন্তু তাঁর কবিতা দ্বারা সজ্ঞানে প্রভাবিত হবার কার্যে নিবিড় হবো ক্রমশ।

এই প্রসঙ্গে 'কবিতা' পত্রিকাকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ না-জানিয়ে উপায় নেই আমাদের; সে যেমন আদিকাল থেকেই আধুনিক কাব্যধারার মূল্যবান সহায়করূপে কার্যক্রম প্রবাহিত করেছে, আজও এতো বছর পরেও দেখিয়ে দিয়েছে তেমনি, তরুণতর সপ্রাণতার চাইতেও সে-ই অধিকতর প্রাণবান হয়তো; স্বয়ং-আরোপিত সম্মানে গম্ভীর নির্বিকার সম্মানী হওয়া ভাণ মাত্র যেহেতু, শ্রদ্ধা জানাতে পেরে শ্রদ্ধেয়, তাই, সে; স্বল্প-সার্থক অনেক পত্রিকার চাইতেই সৎ সার্থকতার অহং-মোহে নির্বিকার নির্বিকল্প হলেও হয়তো তাকেই যা-হোক মানাতো, এ-সব মুখপত্র-মুখী কাগজগুলোকে যা মানায় নি আদৌ।

এই মর্মান্তিক নিদর্শনের পরে সাহিত্য-প্রধানগণ তাঁদের জীবনব্যাপী রক্তক্ষারক সাধনায় সাফল্যলাভ করার পরেও আমাদের রাজনীতিক-সুলভ মননের কাছে তাঁদের মূল্যায়ন দেখে দুঃখিত না-হয়ে পারবেন না হয়তো।—যতোক্ষণ বেঁচে-বর্তে আছো, দিতে পারছো আমাদের দাবির অনুরূপ, খাতির যত্ন স্তাবকতা ততোক্ষণ, নিভে গেলেই ফুরিয়ে গেলো,—এ-সব নিশ্চয়ই তাঁদের ভালো লাগার মতো নয়।

এমন অর্বাচীন কথা এর পরে কেউ বলবে কিনা জানি নে যে, বাহ্য প্রকাশটা কিছু নয়, হৃদয়স্থ করা নিয়েই আসল ব্যাপার, তবে সে-সব কথা শুনতে ভালো যতোটা, সত্যিই ততোটা বড়ো নয় বলে অগ্রাহ্য করা যেতে পারে হয়তো।

এ-সব দিক দিয়ে দেখলে, আমরা নিজেরা এতো বিলম্বে হলেও স্মৃতি-সংখ্যা বার করতে পেরে তৃপ্তি পাচ্ছি, বলতে হবে।

*　　　*

আরেকটা ব্যাপারে আমাদের একটা গোপন তৃপ্তি আছে, সে-কথাটা 'ময়ূখে'র একান্ত বন্ধুদের কাছে জানাতে হয়। 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' ভারত-রাষ্ট্রের পুরস্কার পেয়েছে, এ-খবরটা সর্বজ্ঞাত হলেও অনেকে হয়তো জানেন না যে, এই পুস্তকখানা যাতে পুরস্কৃত না-হয়, তার জন্যে শক্তিশালী সৎপ্রচেষ্টা বাংলা-দেশের অনেক গণ্যমান্য গুরুস্থানীয়রা করেছিলেন! তাঁর বিপক্ষে জনৈক

আধুনিক কবিকেই, শুনেছি, তাঁরা প্রতিযোগী হিসেবে মনোনীত করেছিলেন, যাঁর নাম না-জানানোই বাঞ্ছনীয়। এই সব প্রচ্ছন্ন গুরু ব্যক্তিদের নেপথ্যলোক থেকে উন্মুক্ত মঞ্চের প্রকাশ্যতায় স্ব-স্ব ভূমিকায় নিয়ে আসা যেতে পারে, প্রয়োজনবোধে এই সুধীচক্রীরা আর অবগুণ্ঠিত থাকবেন না হয়তো। গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার দায়িত্ব শুধু কতোগুলি অপাঠ্য বইকে সার্টিফিকেট দিলেই ফুরিয়ে যায় না যেহেতু, অন্য দিকে কর্মধারা প্রবাহিত করতে হলে রবীন্দ্র-নাথের মতো উদার গ্রহণ-নিরপেক্ষতা থাকা যে দরকার তা এঁরা অনুধাবন করতে পারেন না বলেই বিপদ। তবু যা-হোক, সরকারী শিরোপা মানেই যখন পুরস্কৃত হবার যোগ্যতা প্রমাণিত করে না সাধারণত, তখন অন্তত এই একটা যথার্থই ন্যায়নিষ্ঠ কাজের জন্যে সরকারী প্রধানরা ধন্যবাদার্হ হবেন। পাঠক-সাধারণ তৃপ্ত হয়েছেন নিঃসন্দেহে জীবনানন্দ ১৯৪৭-৫৪ সালের সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন যেহেতু; তাঁর মৃত্যুর পরে হলেও তাঁর নামের সঙ্গে স্বাধীন ভারতের বঙ্গ ভাষায় প্রথম পুরস্কারের স্মৃতি বিজড়িত হয়ে রইলো বলে। তবে 'ময়ূখে'র গোপন তৃপ্তিটা এই জন্যে যে, সে স্বাক্ষর-সংবলিত পত্রাদি প্রেরণ করে এই ন্যায়-সাফল্যের সাহায্যে কিঞ্চিৎ উদ্যোগী হয়েছিলো।

*　　　　*

পরিশেষে যাঁদের কাছ থেকে অমেয় সাহায্য পেয়ে আমরা গর্বিত, এবং ধন্য হয়েছি, তাঁদের কাছে সশ্রদ্ধায় ঋণ স্বীকার করা কর্তব্য। নানা কারণে অনেক দিকে আমাদের সামর্থ্য এতো সীমিত ছিলো যে, তাঁদের বিবিধ প্রকার সহায়তা অবশ্যই অত্যাবশ্যক ছিলো বলে আমাদেরও গর্বিত হওয়ার ব্যাপার সে-সব। যাঁদের লেখা আমরা এ-সংখ্যায় পেয়েছি, তাঁরা প্রায় সবাই জীবনানন্দের একনিষ্ঠ সুহৃৎ ও অনুরাগী বলে যেমন সময়ের স্বল্পতা বা অন্যান্য সাধারণ বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সে-সব উত্তরণ করে সহজ আন্তরিকতায় রচনা দিয়েছেন, তেমনি আমাদের ভালোবাসেন বলেই এ-সংখ্যা প্রকাশনের ব্যাপারেও সতত অনুপ্রেরণা, কার্যকরী পরামর্শে সহায়তা নানা দিকে দান করেছেন; নইলে হয়তো আমাদের

মতো অতি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার পক্ষে, এই সংখ্যা যে-টুকুই হয়ে থাক, সে-টুকুও করে তোলার মতো সাহস সঞ্চয় করা শক্ত কাজ হতো। তাঁদের সবার লেখাই যথাসময়ে প্রকাশিত করা যায় নি, নানা কারণে পত্রিকা প্রকাশে যথেষ্ট বিলম্ব করতে বাধ্য হলাম বলে আমরা, অত্যন্ত লজ্জিত হবার মতো ঘটনা এ-সব ; তবু তাঁদের কাছে লজ্জিত হবার মতো কারণ ব্যক্তিগত ভাবে হয়তো নেই আমাদের, কেন-না তাঁদের সস্নেহ উদারতার কাছে আমাদের সব ত্রুটি—ত্রুটিগুলো আমাদের হাতের নাগালের বাইরের কার্যকারণে সঙ্ঘটিত বলে—নিতান্তই গৌণ বিবেচিত হবে হয়তো। তাঁদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার পরিমাপ নেই।

বিশেষ ভাবে নাম করতে হয় কবি-অনুজ শ্রীযুক্ত অশোকানন্দ দাশ-এর। তিনি যে বিস্তৃত মূল্যবান রচনাটি দিয়েছেন তার জন্যে তো বটেই, অন্যান্য ব্যাপারেও তিনি যে-রকম সস্নেহ অন্তরঙ্গতায় আমাদের সব দাবি যথাসাধ্য পূর্ণ করেছেন, তার জন্যেও তাঁর কাছে যথেষ্ট ঋণী রয়েছি আমরা ; জীবনানন্দের অপ্রকাশিত চিঠি-পত্র, রচনা, রচনাপঞ্জী-প্রণয়ন ইত্যাদি প্রসঙ্গেই শুধু নয়, অপরাপর প্রধানতর বিষয়েও তাঁর প্রীতিপূর্ণ সাহায্য দানের তুলনা বিরল।

পত্রিকা প্রকাশের কাজে নিতান্ত স্থূল বৈষয়িক দিক‌গুলো যে নেপথ্যে থাকলেও বেশ গুরুতর, তা যেমন ব্যাখ্যাত করে বলার দরকার করে না, আমাদের মতো ক্ষীণ ক্ষমতার পক্ষে যে সে-গুলো আরো ভীষণ হয়ে দাঁড়াবার মতো, সে-কথা অনুধাবন করার মতো অভিজ্ঞতাও সবারই কিছু-কিছু থাকবার কথা তেমনি। এ-সব দিক থেকে যে অমূল্য সাহায্য পাওয়া গেছে, এবং ভবিষ্যতেও যাবে নিশ্চয়ই শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ রায় ও শ্রীযুক্ত নবেন্দু মহাপাত্র-র কাছ থেকে, ক্রূর প্রতিকূলতার মাঝখানে সেই সব জিনিসই বিশিষ্টতর আশ্রয়ের মতো মনে হওয়া স্বাভাবিক ; মনে হয়েছে আমাদের। তাঁদের কাছে ঋণ স্বীকারের প্রশ্ন ওঠে না, কেন-না নির্মল বন্ধুত্বের ভারও নেই, ঋণও নেই ; আর তাঁরা আজকেরই বন্ধু নন শুধু ; তবু তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া অতুল বন্ধুত্বের কথাটি স্বীকার

করা ভালো। প্রসঙ্গত প্রকাশ্য, '৬ই ফাল্গুন' নামে জীবনানন্দ-জন্মদিবস পালনের যে-ছবিটি মুদ্রিত হলো, তা শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ রায় কর্তৃক গৃহীত।

ডক্টর শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়-এর কাছে কৃতজ্ঞ আমরা এই জন্যে যে, লখ্‌নৌ-য়ে বিগত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতি হিসেবে তাঁর অভিভাষণ থেকে 'মহত্তম কবি জীবনানন্দ দাশ' শীর্ষক অংশটুকু মুদ্রিত করার সুযোগ পেয়েছি আমরা; জীবনানন্দের প্রবন্ধটি বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো এর আগে,—হেমন্ত সংখ্যা 'ময়ূখে' প্রকাশিত প্রবন্ধটি যে-যুক্তিতে পুনর্মুদ্রিত করেছিলাম আমরা, এ-প্রবন্ধটির ব্যাপারেও সে-যুক্তি প্রযোজ্য,—উপযুক্ত সূত্র থেকে প্রকাশিত করার অনুমতি সংগ্রহ করা হয়েছে।

আর অপরাধ স্বীকার করতে হয় 'ময়ূখে'র গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও নির্বিশেষে বন্ধুবৃন্দের কাছে, যথাসময়ে পত্রিকা প্রকাশ করতে পারি নি বলে আমরা; তাঁরা ঘন-ঘন চিঠিপত্রে কেউ-কেউ অনুযোগ করেছেন, কেউ-কেউ আবার আমাদের অসুবিধের কথাটি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে অযাচিত সহানুভূতিও জানিয়েছেন; তাঁদের সবার কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ।

॥ এই সংখ্যাটি এতো দেরীতে প্রকাশিত হলো এবং আকারে এতো বড়ো ও বিশিষ্ট হলো যে, এই সংখ্যাটিকে শীত-বসন্ত-গ্রীষ্ম মিলিত সংখ্যা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এর পরে যাতে যথাসাময়িক হওয়া যেতে পারে, তার জন্যে একটা পরিকল্পনা আছে বলে এই সংখ্যাটিকে মিলিত সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত করে অনেকটা সময় এগিয়ে না-এসে আর উপায় নেই ॥

*　　*

॥ পরবর্তী বর্ষা সংখ্যা, আশা করা যাচ্ছে, আগামী এক মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হবে ; এবং শারদীয়া সংখ্যা মহালয়ার আগেই ॥

*　　*

॥ এখন থেকে 'ময়ূখে' বিজ্ঞাপন নেওয়া হচ্ছে ; বিজ্ঞাপন সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নোক্ত ঠিকানায় পত্রালাপ করে জানতে পারা যাবে।

যাবতীয় টাকা-কড়ি, চেক-ও এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

ভূমেন্দ্র গুহ
২৯ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলকাতা ১২ ॥

*　　*

॥ আগামী সংখ্যা থেকে প্রতি সাধারণ-সংখ্যা 'ময়ূখে'র দাম ধার্য হলো আট আনা ; গ্রাহক মূল্য বার্ষিক তিন টাকা, ডাক মাশুল সমেত ; নতুন যাঁরা গ্রাহক হবেন, তাঁদের পক্ষে নতুন বার্ষিক মূল্য দেয়, পুরাতন গ্রাহকদের এ-বছরের জন্যে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না ॥

জীবনানন্দের প্রকাশিত-ও-অগ্রন্থিত রচনার পঞ্জী

নাম	প্রথম পংক্তি	যে পত্রিকা বা সঙ্কলনে প্রকাশিত
অগ্নি	— আত্মপ্রত্যয়ের অগ্নি, হে সন্তান, প্রথম জ্বলুক তব ঘরে।	— কবিতা : চৈত্র, ১৩৪৫
*	— অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,	— কবিতা : পৌষ, ১৩৬১
অনন্দা	— মানুষ রক্তাক্ত ক্লান্ত হয়ে গেলে অনিমেষ দীপ	— রবিবারের দৈনিক বসুমতী : ?
অন্ধকার থেকে	— গাঢ় অন্ধকার থেকে আমরা এ পৃথিবীর আজকের মুহূর্ত্তে এসেছি।	— মাসিক বসুমতী : মাঘ, ১৩৫৩
অন্ধকারে	— অন্ধকারে থেকে থেকে হাওয়ার আঘাত মাঠের ওপর দিয়ে	— পূর্বাশা : আশ্বিন, ১৩৫৮
অনির্ব্বাণ	— সর্ব্বদাই এ রকম নয়, তবু	— মাসিক বসুমতী : পৌষ, ১৩৫২
অনেক কাউন্সিল কন্‌ফারেন্‌সের শেষে	— এখন নতুন দিন উদ্বেলতা আলো ;	— ?
অনেক নদীর জল	— অনেক নদীর জল উবে গেছে	— চতুরঙ্গ : শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫৯
অনেক মৃত বিপ্লবী স্মরণে	— তারা সব মৃত।	— ইংগিত : পৌষ, ১৩৫৪

অনেক রাত্রিদিন	— অনেক রাত্রিদিন ক্ষয় ক'রে ফেলে	— দৈনিক বসুমতী : শারদীয়া, ১৩৬১
অবরোধ	— বহুদিন আমার এ হৃদয়কে অবরোধ ক'রে রয়ে গেছে ;	— চতুরঙ্গ : আশ্বিন, ১৩৪৮
অবিনশ্বর	—	— পূর্বাশা : শারদীয়া, ১৩৬১
অমৃতযোগ	— জন্মেছিল—চেয়েছিল—ভালোবেসেছিল	— আনন্দবাজার পঃ : শারদীয়া, ১৩৫৮
আজ	— অন্ধ সাগরের বেগে উৎসারিত রাত্রির মতন	— ? : ১৩৫৭
আজ	— আমার হাতের কাজ আজ রাত্রে গিয়াছে ফুরায়ে,—	— শ্রীহর্ষ (?) : ?
আজ	— কেবলি আরেক পথ খোঁজ তুমি ; আমি আজ খুঁজি নাক' আর ;	— আনন্দবাজার পঃ : ১৪ই কার্তিক, ১৩৬১
আজ	— কোথাও রয়েছে মৃত্যু,—কোনো এক দূর পারাপারে	— প্রগতি : ?
আদিম	— প্রথম মানুষ কবে	— কল্লোল : ফাল্গুন, ১৩৩৪
আবহমান	— যেখানে রয়েছে আলো পাহাড় জলের সমবায়—	— পত্রিকা : আশ্বিন, ১৩৪৬
আমরা	— যেই ঘুম ভাঙে নাক' কোনোদিন ঘুমাতে ঘুমাতে	— ধূপছায়া : ?
আমাকে একটি কথা দাও	— আমাকে একটি কথা দাও যা আকাশের মত সহজ মহৎ বিশাল,	— কবিতা : আশ্বিন, ১৩৫৮
আমিষাশী তরবার	— স্মৃতিই মৃত্যুর মত ;—ডাকিতেছে প্রতিধ্বনি গম্ভীর আহ্বানে	— কবিতা : আশ্বিন, ১৩৪৬

আস্লোক পত্র	— হে নদী আকাশ মেঘ পাহাড় বনানী,	— যুগান্তর : শারদীয়, ?
আলোকপাত	— আকাশ দিয়ে উ'ড়ে গেল শাদা হাঁসের ভিড়।	— যুগান্তর : শারদীয়, ?
আলোপৃথিবী	— আলোয় ভূমিষ্ঠ হ'তে ভালো লেগেছিল :	— আনন্দবাজার পঃ : বাঃ সংখ্যা, ১৩৫৯
আলোপৃথিবী	— ঢের দিন বেঁচে থেকে দেখেছি পৃথিবীভরা আলো ;	— দেশ : ১৩ই কার্তিক, ১৩৬১
আলোকস্তম্ভ	— কোথায় আলোকস্তম্ভ রয়ে গেছে সমুদ্রের জলে।	— পত্রিকা : মাঘ, ১৩৪৬
আশা,অনুমিতি	— সূর্য্যের আকাশের মত মানুষেরো অনুভাবনায় স্থির	— একক : ১ম সংখ্যা, ১৩৫৮
আশা ভরসা	— ইতিহাসপথ বেয়ে অবশেষে এই	— দ্বন্দ্ব : আষাঢ়, '৫৭
ইতিহাসযান	— সেই শৈশবের থেকে এ সব আকাশ মাঠ রৌদ্র দেখেছি ;	— পূর্বাশা : বৈশাখ, ১৩৫৩
উত্তরসামরিকী	— আকাশের থেকে আলো নিভে যায় ব'লে মনে হয়।	— দৈনিক বসুমতী : শারদীয়া, ?
উদয়াস্ত	— সূর্য্যের উদয় সহসা সমস্ত নদী	— কবিতা : আষাঢ়, ১৩৪৬
উপলব্ধি	— যা পেয়েছি সে সবের চেয়ে আরো স্থির দিন পৃথিবীতে আসে ;	— উত্তরসূরী : পৌষ-ফাল্গুন, ১৩৬১ ('শতাব্দী' থেকে সঙ্কলিত)
উপলব্ধি	— সময়ের বিশৃংখলা তোমার হৃদয়ে যদি কুয়াশার আলোড়ন আনে,	— পরিক্রমা : বসন্ত, ১৩৪৯

এই কি সিন্ধুর হাওয়া	— এই কি সিন্ধুর হাওয়া ?—রোদ আলো বনানীর বুকের বাতাস	— ক্রান্তি : শারদীয়া, ?
এই চেতনা	— হলুদ কমলা ধূসর মেঘের ফাঁক দিয়ে	— সাহিত্যপত্র : কার্তিক, ?
এই পথ দিয়ে	— এই পথ দিয়ে কেউ চ'লে যেত জানি।	— ক্রান্তি : শারদীয় সংক:, ১৩৫৪
এই পৃথিবীর	— এই পৃথিবীর বুকের ভিতর কোথাও শান্তি আছে ;	— পূর্বাশা : বৈশাখ, ১৩৬০
এই শতাব্দী-সন্ধিতে মৃত্যু (অগণন সাধারণের)	— সে এক বিচ্ছিন্ন দিনে আমাদের জন্ম হয়েছিল,	— ? : আশ্বিন, ১৩৫০
এই সব দিনরাত্রি	— মনে হয়, এর চেয়ে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ভালো	— চতুরঙ্গ : কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৬
	— এক অন্ধকার থেকে এসে	— কবিতা : পৌষ, ১৩৬১
একটি কবিতা	— আমার আকাশ কালো হতে চায় সময়ের নির্মম আঘাতে ;	— কবিতা : চৈত্র, ১৩৫৫
একটি কবিতা	— সুখের চেয়েও বেশী শান্তি চেয়েছি।	— ? : আশ্বিন, ১৩৪৯
একটি নক্ষত্র আসে	— একটি নক্ষত্র আসে ; তারপর একা পায়ে চ'লে	— কবিতা : পৌষ, ১৩৬০
এখন এ পৃথিবীর	— 'এখন এ পৃথিবীর গোধূলি সময় আর— আমাদের হৃদয়ের যেন বেলাশেষ—'	— চতুরঙ্গ : বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬০
	— ঐখানে সারাদিন উঁচু ঝাউ বন খেলা করে।	— ময়ূখ, জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা ১৩৬১-২
কখনো নক্ষত্রহীন	— কখনো নক্ষত্রহীন কুয়াশার রাতে	— পূর্বাশা : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১

কার্তিক-অঘ্রাণ ১৯৪৬	— পাহাড়, আকাশ, জল অনন্ত প্রান্তর	— আনন্দবাজার পঃ: শারদীয়া, ?
কার্তিক ভোরে : ১৩৪০	— কার্তিকের ভোরবেলা করে	— শতভিষা : শারদীয়া, ১৩৬১
কার্তিকের ভোর— ১৩৫০	— চারিদিকে ভাঙনের বড় শব্দ,	— ? : ১৩৬১
কুজ্ঝটিকায় আকাশ মলিন	— কুজ্ঝটিকায় আকাশ মলিন হ'য়ে থাকে কি যে!	— ক্রান্তি : কার্তিক, ১৩৬১
কুহুলিন	— এইখানে অন্ধকার রচনা ক'রেছে তার সপ্রতিভ মুখের পৃথিবী।	— ? : আশ্বিন, ১৩৪৮
কে এসে যেন	— কে এসে যেন অন্ধকারে জ্বালিয়ে দিল বাতি ;	— শতভিষা : শরৎ, ১৩৬০
কেন মিছে নক্ষত্রেরা	— কেন মিছে নক্ষত্রেরা আসে আর? কেন মিছে জেগে ওঠে নীলাভ আকাশ?	— আনন্দবাজার পঃ: বাঃ সংখ্যা, ১৩৬১
কোরাস	— গম্ভীর নিপট মূর্ত্তি সমুদ্রের পারে	— কবিতা : পৌষ, ১৩৫৮
ক্রান্তিবলয়	— মৃত্যু আর সূর্যকরোজ্জ্বল এই পৃথিবী বুকের ভিতরে	— আনন্দবাজার পঃ: শারদীয়া, ১৩৫৭
গতিবিধি	— সর্ব্বদাই প্রবেশের পথ র'য়ে গেছে ;	— নিরুক্ত : আশ্বিন, ১৩৪৭
গভীর এরিয়েলে	—ডুবল সূর্য্য ; অন্ধকারের অন্তরালে হারিয়ে গেছে দেশ।	— দৈনিক বসুমতী : শারদীয়া, ?
গরিমা	— সহসা ঝড়ের দিনে লুণ্ঠনের উর্দ্ধে উঠে ছিল	— নিরুক্ত : আশ্বিন, ১৩৪৮
	— ঘড়ির দুইটি ছোটো কালো হাত ধীরে—	কবিতা : পৌষ, ১৩৬১

ঘাস	— মরণ তাহার দেহ কোঁচকায়ে ফেলে গেল	— কবিতা : আশ্বিন, ১৩৪৮
চারিদিকে প্রকৃতির	— চারিদিকে প্রকৃতির ক্ষমতা নিজের মত ছড়ায়ে রয়েছে	— চুনুটা প্রকাশ : শারদীয়া, ?
চেতনালিখন	— শতাব্দীর এই ধূসর পথে এরা ওরা যে যার প্রতিসারী	— মাসিক বসুমতী : ?
চেতনা-সবিতা	— সূর্য্য কখন পশ্চিমে ঢ'লে মশালের মত ভেঙে	— যুগান্তর : শারদীয়, ১৩৫৫
জন্মতারকা	— মাথার ওপর দিয়ে ভেসে যায় চিল,	— কল্পনা-সাহিত্য : ভাদ্র, ১৩৬১
জর্ণাল ১৩৪২	— হিজল ঝাউয়ের ডাল জ্বলছে সূর্যের আলোড়নে ;	— ঊষা : শারদীয়া, ১৩৬১
জর্ণাল : ১৩৪৬	— আজকে অনেকদিন পরে আমি বিকেলবেলায়	— চতুরঙ্গ : বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬১
জয়জয়ন্তীর সূর্য্য	— কোনো দিন নগরীর শীতের প্রথম কুয়াশায়	— দৈনিক কৃষক : শারদীয়, ১৩৫২
জার্মাণীর রাত্রি-পথে : ১৯৪৫	— সে এক দেশ অনেক আগের শিশুলোকের থেকে	— মাসিক বসুমতী : ?
জীবন	— কেবলি সত্যের বলয় লাভ করতে চলেছ তুমি	— ?
জীবনবেদ	— অনেক বছর কেটে গেছে,	— দেশ : ?, ১৩৫৯
জীবনসঙ্গীত	— ষ্ট্রেচারের পরে শুয়ে কুয়াসা ঘিরিছে বুঝি তোমার দু চোখ :	— চতুরঙ্গ : চৈত্র, ১৩৪৫
ঝরা ফসলের গান	— আঁধারে শিশির ঝরে,	— কল্লোল : পৌষ, ১৩৩৪

তার স্থির প্রেমিকের নিকট-কোনো উদ্দীপিতা	— বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই— আমি বলি না তা।	— কবিতা : পৌষ, ১৩৪৫
তিমিরসূর্যে	— বাহিরের থেকে ফিরে এসো ;	— আনন্দবাজার পঃ : শারদীয়া : ?
তোমাকে	— ভেবেছিলাম একথা স্থির মেনে নিতে পারি	— বর্ধমান : শারদীয়, ১৩৬১
তোমাকে	— মাঠের ভিড়ে গাছের ফাঁকে দিনের রৌদ্র অই	— মাসিক বসুমতী : ?
তোমাকে ভালোবেসে	— আজকে ভোরের আলোয় উজ্জ্বল	— দেশ : শারদীয়া, ১৩৬১
	— তোমায় আমি দেখেছিলাম ঢের	— কবিতা : পৌষ, ১৩৬১
দাও দাও সূর্যকে	— দাও দাও সূর্যকে জাগিয়ে দাও	— একক (?) : ?
দিনরাত্রি	— সমস্ত দিন	— পূর্বাশা : ফাল্গুন, ১৩৫৬
দু'টি কবিতা	— (১) চারিদিকে নীল হয়ে আকাশ ছড়িয়ে আছে দেখে	— উষা : ?
	(২) জীবনের এই শাদা কালো রঙের মুখে এসে	
দু'টি তুরঙ্গম	— আকাশে সমস্ত দিন আলো ;	— দেশ : ২১শে কার্তিক, ১৩৬০
	— দুদিকে ছড়িয়ে আছে দুই কালো সাগরের ঢেউ	— কবিতা : পৌষ, ১৩৬১
দেশ কাল সন্ততি	— কোথাও পাবে না শান্তি—যাবে তুমি একদেশ থেকে দূর দেশে ?	— যুগান্তর : শারদীয়, ১৩৫৭

দেশ কাল সন্ততি	— চারিদিকে আছে ব্যস্ত নদীদের ক্ষণ :	— উষা : শারদীয়া, ১৩৬০
দোয়েল	— একটি নীরব লোক মাঠের উপর দিয়ে চুপে	— কবিতা : পৌষ, ১৩৪৯
নদী	— বঁইচির ঝোপ শুধু—শাইবাবলার ঝাড়—আর জাম হিজলের বন,—	— কবিতা : আশ্বিন, ১৩৪৩
নদী নক্ষত্র মানুষ	— 'এখানে জলের পাশে বসবে কি ? জলঝিরি এ নদীর নাম ;	— দেশ : ২রা আশ্বিন, ১৩৬০
নব নব সূর্যে	— মানুষ সার্থক হয় মাঝে মাঝে, তবু	— দেশ : ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬০
নব প্রস্থান	— শীতের কুয়াশা মাঠে ; অন্ধকারে এইখানে আমি।	— যুগান্তর : শারদীয়, ১৩৫৩
নবহরিতের গান	— চারদিকেতে হলদে কালো শাদার পৃথিবীর	— একক : শারদীয়, ১৩৬০
নক্ষত্রব্যাপ্তির রাতে	— দীনাত্মা সব তারকাদের আভার থেকে উৎসারিত হয়ে	— উজ্জীবন : ?
নারীসবিতা	— আমরা যদি রাতের কপাট খুলে ফেলে এই পৃথিবীর নীল সাগরের বারে	— চতুরঙ্গ : ? আশ্বিন, ?
নিজেকে নিয়মে ক্ষয়	— নিজেকে নিয়মে ক্ষয় ক'রে ফেলে রোজই	— একক (?) : ১৩৬০
নির্দেশ	— জীর্ণ শীর্ণ মাকু নিয়ে এখন বাতাসে	— নিরুক্ত : আশ্বিন, ১৩৪৭
নিরীহ, ক্লান্ত ও মর্মান্বেষীদের গান	— আমরা বিশেষ কিছুই চাই না এবার ।	— দেশ : শারদীয়া, ১৩৪৯

নিবিড়তর	— হৃদয়ে যে স্রোত আছে অন্ধকারে লীন	— দেশ : শারদীয়া, ১৩৫৯
নিশির ডাক	— যারা পারে—যারা পারে নাক' তাহাদের শেষ রক্ত	— শ্রীহর্ষ : শারদীয়, ১৩৪৫
নিঃসরণ	— দুর্গের গৌরবে ব'সে প্রাংশু আত্মা ভাবিতেছে ঢের পূর্ব্বপুরুষের কথা :	— কবিতা : কার্তিক, ১৩৪৬
পটভূমি	— আকাশ ভ'রে যেন নিখিল বৃক্ষ ছেয়ে তারা	— ক্রান্তি : ফাল্গুন, ১৩৬০
পটভূমি কল্লোল	— বিকেলবেলার আলো ক্রমে নিভছে আকাশ থেকে।	— পূর্বাশা : শ্রাবণ, ১৩৫৩
পটভূমিবিসার	— কবের সে বেবিলন থেকে আজ শতাব্দীর পরমায়ু শেষ	— মেঘনা (সংকলন) : ১৩৫৪
পলাতক	— কা'রা অশ্বারোহী কবে ঊষাকালে এসে	— প্রগতি : পৌষ, ১৩৩৪
পৃথিবী আজ	— প্রকৃতি থেকে ফসল জল নীলকণ্ঠ এল :	— সত্যযুগ : শারদীয়, ১৩৫৭
পৃথিবী ও সময়	— সময়ের উপকণ্ঠে রাত্রি প্রায় হয়ে এলে আজ	— ক্রান্তি : ১ম বর্ষ
পৃথিবী গ্রহবাসী	— বিকেলবেলা গড়িয়ে গেলে অনেক মেঘের ভিড়	— চতুরঙ্গ : শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫৫
পৃথিবী, জীবন, সময়	— কোথায় সে যে র'য়েছিলাম ;—	— গণবার্তা : শারদীয়া, ১৩৫৮
পৃথিবীর রৌদ্রে	— কেমন আশার মত মনে হয় রোদের পৃথিবী,	— ?
পৃথিবীলোক	— দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙে ;	— ?

পৃথিবী সূর্য্যকে ঘিরে	— পৃথিবী সূর্য্যকে ঘিরে ঘুরে গেলে দিন	— বসুমতী : শারদীয়া : ১৩৫৩
প্রিয়দের প্রাণে	— অনেক পুরোনো দিন থেকে উঠে নতুন শহরে	— অলকা : ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৪৯
প্রেমিক	— সময় অনেক চিহ্ন লক্ষ্য ভেঙেফেলে ;	— বন্দে মাতরম্ : শারদীয়, ১৩৬১
বাতাসের শব্দ এসে	— বাতাসের শব্দ এসে কিছুক্ষণ হরিতকী গাছের শাখায়	— ? : আশ্বিন, ১৩৫৯
বাসনা	— পিঙ্গল রাস্তার 'পরে এখন নেমেছে রাত্রি	— পত্রিকা : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭
বিপাশা	— অনেক বছর হ'ল সে কোথায় পৃথিবীর মনে মিশে আছে।	— ?
বিভিন্ন কোরাস	— আমাদের হৃদয়ের নদীর উপর দিয়ে ধীরে	— নিরুক্ত : আশ্বিন, ১৩৪৯
বিস্ময়	— কখনো বা মৃত জনমানবের দেশে	— কবিতা : পৌষ, ১৩৪৬
বৃক্ষ	— মৃগতৃষ্ণার পিছে ধাবমান হওয়া নয় আর ;	— দেশ : ২৭শে কার্তিক, ১৩৬১
মনবিহঙ্গম	— ঢের যুগ নিস্ফল হয়েছে ;	— পূর্বাশা : আশ্বিন, ১৩৫৯
মরুতৃণোজ্জ্বলা	— হেঁয়ালি রেখো না কিছু মনে ;	— ক্রান্তি : শ্রাবণ, ১৩৬১
মহাইতিহাস	— জীবনে কখনো প্রেম হয়েছিল বুঝি ;	— ক্রান্তি : আশ্বিন, ১৩৬১
মহাগোধূলি	— সোনালি খড়ের ভারে অলস গরুর গাড়ি—বিকেলের রোদ পড়ে আসে।	— উত্তরসূরী : ২য় সংখ্যা, ১৩৬১

মহাগ্রহণ	— অনেক সংকল্প আশা নিভে মুছে গেল ;	— চতুরঙ্গ : বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩৫৮
মহাজিজ্ঞাসা	— ছিলাম কোথায় যেন নীলিমার নীচে ;	— আনন্দবাজার পঃ : শারদীয়া, ১৩৬১
মহাত্মা	— আলোর মতন ব্যাপ্ত অন্তরাত্মা নিয়ে	— একক (?)
মহাত্মা গান্ধী	— অনেক রাত্রির শেষে তারপর এই পৃথিবীকে	— পূর্বাশা : ফাল্গুন, ১৩৫৪
মহাত্মাজী	— সফল উজ্জ্বল ভোর পৃথিবীতে আসে ;	— ? : ৪র্থ সংখ্যা
মহাপতনের ভোরে	— কেবলি স্বপ্নের ক্ষয় হয় ;	— যুগান্তর : শারদীয়, ১৩৫৮
মহিলা	— এইখানে শূন্যে অনুভাবনীয় পাহাড় উঠেছে	— নিরুক্ত : চৈত্র, ১৩৪৯
মাঘসংক্রান্তির রাতে	— হে পাবক, অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে	— দ্বন্দ্ব (?)
মানুষ চারিয়ে	— এবার তৃতীয়বার চ'লে যাব বিদেশ ভ্রমণে ;	— দিগন্ত : শারদীয়, ১৩৫০
মানুষ যেদিন	— মানুষ যেদিন প্রথম এই পৃথিবী পেয়েছিল—	— সেতু : সংকলন ৩
মূল্যনাশের দিনে	— আমি সূর্য্য প্রান্তরের নক্ষত্রের স্বপ্ন দেখেছি ;	— মাসিক বসুমতী : ?
মৃত মাংস	— ডানা ভেঙে ঘুরে ঘুরে পড়ে গেল ঘাসের উপরে	— কবিতা : পৌষ, ১৩৪২
মৃত্যু	— হাড়ের ভিতর দিয়ে যারা শীত বোধ করে	— কবিতা : আশ্বিন, ১৩৪৬

মৃত্যু আর মাছরাঙাঝিলমিল	— মৃত্যু আর মাছরাঙাঝিলমিল পৃথিবীর বুকের ভিতরে	— ময়ূখ : শরৎ, ১৩৬০
মৃত্যু, সূর্য্য, সঙ্কল্প	— সর্ব্বদাই অন্ধকারে মৃত্যু এক চিন্তার মতন :	— ৯ই আগস্ট (সংকলন) : ১৯৪৭
মৃত্যু, স্বপ্ন, সঙ্কল্প	— আঁধার হিমের রাতে আকাশের তলে	— মাসিক বসুমতী : ?
যতদিন পৃথিবীতে	— যতদিন পৃথিবীতে জীবন রয়েছে	— দেশ : ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০
যতিহীন	— বিকেলবেলা গড়িয়ে গেলে অনেক মেঘের ভিড়	— চতুরঙ্গ : ?
যদিও দিন	— যদিও দিন কেবলি নতুন গল্পবিশ্রুতির	— দেশ : শারদীয়া, ১৩৬০
যাত্রা	— কতদিন হ'য়ে গেল ;	— উত্তরসূরী : ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৫৯
যাত্রী	— মানুষের জীবনের ঢের গল্প শেষ	— কবিতা : চৈত্র, ১৩৫৯
যুবা অশ্বারোহী	— যুবা অশ্বারোহী	— কালিকলম : ?
যে কোনো আকাশে	— যে কোনো আকাশে মৃত্যু আছে	— স্বরাজ (?) : ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০
*	— রক্ত নদীর তীরে কালো পৃথিবীর	— কবিতা : পৌষ, ১৩৬১
রবীন্দ্রনাথ	— অনেক সময় পাড়ি দিয়ে আমি অবশেষে কোনো এক বলয়িত পথে	— রবীন্দ্র-স্মৃতি-পূর্বাশা
রবীন্দ্রনাথ	— দেয়ালচিত্রের শীর্ষে পৃথিবীর কোনো এক আশ্চর্য্য প্রাসাদে,—	— পরিচয় : অগ্রহায়ণ, ?
রবীন্দ্রনাথ	— 'মানুষের মনে দীপ্তি আছে,	— ঊষা : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১
রশ্মি এসে পড়ে	— রশ্মি এসে পড়ে—ভোর হয়,	— শতভিষা : ?

রাত্রি	— অইখানে কিছু আগে—বিরাট প্রাসাদে—এক কোণে	— নিরুক্ত : পৌষ, ১৩৪৭
রাত্রি ও ভোর	— শীতের রাতের এই সীমাহীন নিস্পন্দ গহ্বরে	— দিগন্ত : শ্রাবণ, ১৩৫৪
রাত্রি দিন	— একদিন এ পৃথিবী জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষায় বুঝি স্পষ্ট ছিল, আহা :	— ময়ূখ : শারদীয়, ১৩৬১
রাত্রি, মন, মানবপৃথিবী	— এ অন্ধকার জলের মত ; এই পৃথিবীর সকল কিণার ঘিরে	— দৈনিক সত্যযুগ (?)
রোদ এখনও খেলছে	— রোদ এখনও খেলছে মাঠে গাছে,	— কল্পনা-সাহিত্য : শারদীয়, ১৩৬১
লক্ষ্য	— এখানে অর্জুন ঝাউয়ে যদিও সন্ধ্যার চিল ফিরে আসে ঘরে	— জয়শ্রী : শারদীয়া, ১৩৬১
হঠাৎ-মৃত	— অজস্র বুনো হাঁস পাখা মেলে উড়ে চলেছে জ্যোৎস্নার ভিতর	— কবিতা : পৌষ, ১৩৪৪
হেমন্ত	— আজ রাতে মনে হয়	— কবিতা : কাতিক, ১৩৪৬
হেমন্তরাতে	— শীতের ঘুমের থেকে এখন বিদায় নিয়ে বাহিরের অন্ধকার রাতে	— চতুরঙ্গ : আশ্বিন, ?
হে হৃদয়	— হে হৃদয়, একদিন ছিলে তুমি নদী ;	— কবিতা : চৈত্র, ১৩৪৬
হৃদয়, তুমি	— হৃদয়, তুমি সেই নারীকে ভালোবাস তাই	— কবিতা : চৈত্র, ১৩৫৯
শত শতাব্দীর	—মানুষ অনেক দূর চ'লে যায়—চ'লে যেতে চায়	— পূর্বাশা : বৈশাখ, ১৩৫৯
শতাব্দী	— চারিদিকে নীল সাগর ডাকে অন্ধকারে, শুনি ;	— দেশ : ৩০শে ভাদ্র, ১৩৫৭

শতাব্দীর মানবকে	— চারিদিকে কঠিন পটভূমি ;	— আনন্দবাজার পঃ : বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৬০
শতাব্দী শেষ	— সূর্য্যগরিমার নিচে মানুষের উচ্ছ্রিত জীবন	— একক : আশ্বিন, ১৩৫০
শান্তি	— জীবন কি নীরক্ত সম্রাট এক সুধাখোর :	— কবিতা : চৈত্র, ১৩৪৬
শ্রুতি-স্মৃতি	— আলোর চেয়েও তার সহোদরা আঁধারের পথে বারবার জন্ম নিয়ে	— নিরুক্ত : চৈত্র, ১৩৪৫
সন্ধিহীন, স্বাক্ষরবিহীন	— কোথায় সূর্য্যের যেন নব নব জন্ম ঘিরে	— কবিতা : চৈত্র, ১৩৪৬
সময়	— মৃত্যুসাগর সরিয়ে সূর্যে বেঁচে মানুষ তোমায় ধন্যবাদ	— প্রাঙ্গণ : বৈশাখ, ১৩৬১
সময়সেতুপথে	— ভোরের বেলায় মাঠ প্রান্তর নীলকণ্ঠ পাখি,	— একক : ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৫৪
সময়ের তীরে	— আজকের জীবনের এই হিংসা, রক্তাক্ততা, মিথ্যা, বর্ব্বরতা দেখে	— ?
সময়ের তীরে	— নিচে হতাহত সৈন্যদের ভিড় পেরিয়ে,	— মাসিক বসুমতী : ?
	— সময় মুছিয়া ফেলে সব এসে	ময়ূখ : জীবনানন্দ-স্মৃতি সংখ্যা, ১৩৬১-২
সমিতিতে	— এইখানে বিকেলের সমিতিতে অগণন লোক	— কবিতা : আশ্বিন, ১৩৪৮
সমুদ্রপায়রা	— কেমন ছড়ানো লম্বা ডানাগুলো সারাদিন সমুদ্র-পাখির।	— বৈশাখী সংকলন : ?
সামান্য মানুষ	— একজন সামান্য মানুষকে দেখা যেত রোজ	— নিরুক্ত : চৈত্র, ১৩৪৯

সারাৎসার	— এখন কিছুই নেই— এখানে কিছুই নেই আর,	— কবিতা : চৈত্র, ১৩৫৫
সুমেরীয়	— ক্রমে ধুলো উড়ে যায় বিকালের অন্তহীন পাটল আকাশে ;	— কবিতা : আশ্বিন, ১৩৪৬
সূর্য্য কখন	— সূর্য্য কখন পশ্চিমে ঢলে	— ?
সূর্য্যকরোজ্জ্বলা	— আমরা কিছু চেয়েছিলাম প্রিয় ;	— মাসিক বসুমতী : ফাল্গুন, ১৩৫৬
সূর্য্য নক্ষত্র নারী	— তোমার নিকট থেকে সর্ব্বদাই বিদায়ের কথা ছিল	— পূর্বাশা : কার্তিক, ১৩৫৩
সূর্য নিভে গেলে	— উত্তীর্ণ হয়েছে পাখী নদী সূর্যে অন্ধ আবেগের	— একক : ২য় সংখ্যা, ১৩৫৯
সূর্য্য রাত্রি নক্ষত্র	— এইখানে মাইল মাইল ঘাস ও শালিখ রৌদ্র ছাড়া কিছু নেই	— ?
সূর্য্যসাগর তীরে	— সূর্য্যের আলো মেটায় খোরাক কার :	— পত্রিকা : আশ্বিন, ১৩৪৬
সৃষ্টির সময়	— সৃষ্টির সময় আসে পৃথিবীর মানুষের ;	— বর্তমান : ভাদ্র-আশ্বিন, ?
সে	—আমাকে সে নিয়েছিল ডেকে ;	— দেশ : ?, ১৩৬১
সৌরচেতনা	— এইখানে অন্ধকার সমুদ্রের জলে	— চয়নিকা : ফাল্গুন, ১৩৫৮
স্বাতীতারা	— স্বাতীতারা, কবে তোমায় দেখেছিলাম কলকাতাতে আমি	— আনন্দবাজার পঃ শারদীয়া, ১৩৫৬
১৩৩৬-৩৮ স্মরণে	— অনেক চিন্তার সূত্র সমবায়ে একটি মহৎ দিন	— কবিতা : আশ্বিন, ১৩৪৭
১৯৪৬-৪৭	— দিনের আলোয় অই চারিদিকে মানুষের অস্পষ্ট ব্যস্ততা	— পূর্বাশা : কার্তিক, ১৩৫৫

প্রবন্ধ : বাংলা

কবিতার কথা — কবিতা : বিশেষ সংখ্যা : বৈশাখ, ১৩৪৫

কবিতা, তার আলোচনা — পূর্বাশা : বৈশাখ, ১৩৫৬

কবিতা সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ — পূর্বাশা : কার্তিক, ১৩৫৩

কবিতাপাঠ — পূর্বাশা : আষাঢ়, ১৩৫৬

দেশ কাল ও কবিতা — পূর্বাশা : আশ্বিন, ১৩৫৬

সত্য, বিশ্বাস ও কবিতা — পূর্বাশা : মাঘ, ১৩৫৬

রুচি, বিচার ও অন্যান্য কথা — পূর্বাশা : চৈত্র, ১৩৫৬

যুক্তিজিজ্ঞাসা ও বাঙালী — পূর্বাশা : বৈশাখ, ১৩৫৯

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যত — দেশ : ১৬ই চৈত্র, ১৩৫৮

কবিতা : বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ — চতুরঙ্গ : আশ্বিন, ১৩৫৭

আধুনিক কবিতা — দ্বন্দ্ব : শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৭

কবিতাপাঠ : দুজন কবি — আনন্দবাজার পত্রিকা : শারদীয়া, ১৩৫৪

কবিতার আত্মা ও শরীর — বসুমতী : শারদীয়া, ১৩৫৪

কি হিসেবে শাশ্বত — আনন্দবাজার পঃ : বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৫৫

অসমাপ্ত আলোচনা — চতুরঙ্গ : কার্তিক-পৌষ, ১৩৬০

নজরুলের কবিতা — কবিতা : নজরুল সংখ্যা : কার্তিক-পৌষ, ১৩৫১

শিক্ষাদীক্ষা — দেশ : ২১শে ভাদ্র, ১৩৫৯

শিক্ষার কথা — দেশ : ১৪ই ভাদ্র, ১৩৫৯

শিক্ষা-দীক্ষা—শিক্ষকতা — মাসিক বসুমতী : কার্তিক, ১৩৫৫

শিক্ষা ও ইংরাজী — বসুমতী : শারদীয়া, ১৩৬০

উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য — ময়ূখ : কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৬১

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা— ময়ূখ : জীবনানন্দস্মৃতি সংখ্যা, ১৩৬১-২

সাহেবিয়ানা — মাসিক বসুমতী : আশ্বিন, ১৩৬০

রবীন্দ্রনাথ	— স্বরাজ সাময়িকী : ২৪শে শ্রাবণ, ১৩৫৪
মাত্রাচেতনা	— প্রভাতী : পৌষ, ১৩৫১
আমার মা ও বাবা	— উত্তরসূরী : জীবনানন্দ সংখ্যা, ১৩৬১
কেন লিখি	— ফ্যাশিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের পক্ষে বাংলার বিশিষ্ট কথাশিল্পীদের জবানবন্দীর সঙ্কলন 'কেন লিখি' : মাঘ, ১৩৫০

আলোচনা

বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী'র সমালোচনা— কবিতা : পৌষ, ১৩৪৪

কৃষ্ণ ধর-এর 'অঙ্গীকার'-এর সমালোচনা— চতুরঙ্গ : মাঘ, ১৩৫৫

প্রবন্ধ : ইংরেজি

Bengali Poetry Today	— The Sunday Statesman Magazine : Nov. 6., 1949
In for The Deluge ?	— The Eastern Express : Puja Number, 1945
Literature and Contributives	— Contemporary : published by Comrade Publishers
The Bengali Novel Today	— The Sunday Hindusthan Standard Magazine : Sept. 3., 1950

পুস্তক-সমালোচনা

Gioconda Smile. A *play* by Aldus Huxley	— চতুরঙ্গ : শ্রাবণ, ১৩৫৫
Doctor Faustus. A *Novel* by Thomas Mann	— চতুরঙ্গ : মাঘ, ১৩৫৬
The Journal of André Gide Vol II, 1914-1927	— চতুরঙ্গ : মাঘ, ১৩৫৫

পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে : আধুনিক সাহিত্য

The three voices poetry by T. S. Eliot	— ঊষা : ৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

■ জীবনানন্দ দাশের যে-সব রচনা প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নি, সে-সব রচনার একটি পঞ্জী সঙ্কলন করার চেষ্টা করা হয়েছে। কবি নিজের লেখার কাটিং নিয়মিত ভাবে না রাখলেও, কিছু-কিছু রেখেছিলেন বলে স্বভাবতই আমাদের পক্ষে পঞ্জীপ্রণয়নের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়েছে; যদিও অনেক কাটিং-য়েই পত্রিকার নাম বা সালের উল্লেখ যথাযথ ছিলো না বলে আমাদের অন্যান্য উপায়ে তৎপর হতে হয়েছে। এ-সব ব্যাপারে ও কাটিং ছিলো না এমন অনেক রচনা সংগ্রহে আমরা নানা সূত্র থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি, এ-কথা স্বীকার্য; 'পূর্বাশা'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্য দয়া করে আমাদের 'পূর্বাশা' ও 'নিরুক্ত' পত্রিকার সম্পূর্ণ সেট ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছেন যেমন, তেমনি শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত 'কবিতা'র পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত লেখপঞ্জীও আমাদের কিছু সাহায্য করেছে; শ্রীযুক্ত বিরাম মুখোপাধ্যায় তিনটি কবিতার খবর অনুগ্রহ করে আমাদের জানিয়েছেন; নিকটতর বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকেও কিছু-কিছু সাহায্য পাওয়া গেছে এ-ছাড়া। এঁদের সকলের কাছে আমরা আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রচণ্ড পরিশ্রম সত্ত্বেও তবু লেখপঞ্জীতে প্রত্যেকটি লেখার ঈপ্সিত পরিচয় যে সন্নিবেশিত করা গেছে, তা নয়, অংশত বা সার্বিক ভাবে অনেক স্থলেই ফাঁকটা পূর্ণ করা যায় নি, ?-চিহ্নের প্রচুর সাধারণ্যেই তা অনুমেয়। তা ছাড়া, অনেক রচনাই সংগ্রহ করা যায় নি নিশ্চয়। প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় ?-র সমাধানে সমষ্টির ঐকান্তিকতা প্রয়োজন। একক চেষ্টায় কখনোই হয়তো এ-সব ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভ সম্ভব নয়। অনেকগুলি লেখাতে দেখা যাবে আবার যে শিরোনামার স্থান *-চিহ্নিত; কবির মৃত্যুর পরে তাঁর যে-সব লেখা নামকরণে শূন্যতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, সে-সব শীর্ষক-শূন্যতার স্থলে স্বভাবতই আমরা *-চিহ্নের ব্যবহার করেছি। অনেক লেখা প্রকাশিত হবার পরে আবার কবি-কর্তৃক পরিমার্জিত এবং শিরোনামা পরিবর্তিত হয়েছে; প্রকাশিত লেখাতেও বক্তব্যের পর্যাপ্ত

স্বচ্ছতার জন্যে জীবনানন্দকে ক্রমাগত যে-রকম নিবিষ্ট ভাবে কাটাকুটি করতে দেখা গেছে তা অত্যন্তই অনন্যসাধারণ বলে প্রায়-নবকলেবর প্রাপ্ত কবিতার সংখ্যা প্রচুর। আমরা তাই ব্যাপক পরিমার্জনার দিকে না-তাকিয়ে স্থানের সংক্ষিপ্ততাহেতু মার্জিত কবিতাগুলোর প্রাক্তন নাম প্রায় সর্বত্র সন্নিবেশিত করলাম, কোনো নতুন গ্রন্থ যখন তাঁর প্রকাশিত হতে পারবে পরে, সেই সব আশ্চর্য রূপান্তরিত রচনাগুলো পাঠকেরা তখন পাবেন।

বলাই বাহুল্য যে, এ-রকম পঞ্জী প্রথম প্রয়াসে কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না। বহু রচনা নিশ্চয়ই ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে, যা পরিপূর্ণ উদ্ধার করতে হলে কবির অনুরাগী পাঠক-নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন; তিনি কাউকেই বিমুখ করতেন না বলে ছোটো-বড়ো অনেক কাগজেই লেখা দিয়েছিলেন, যাদের অনেকগুলি বর্তমানে বিলুপ্ত; অনেকগুলো আছে, আবার যাদের প্রচার সীমিত এতো যে, তাদের সব সংখ্যা, তারা এখনো বেঁচে আছে যদিও, সংগ্রহ করা বেশ শক্ত কাজ; এ-সব পত্রিকার ব্যাপারে, উৎসাহী ও সহৃদয় পাঠক-সাধারণ, অনেক স্থলে আবার সংশ্লিষ্ট সম্পাদকগণ বিশেষ করে, যদি সহযোগিতাপরায়ণ হয়ে এই পঞ্জীতে নেই এমন সব রচনার খবর দয়া করে আমাদের জানান তবে লেখপঞ্জী সম্পূর্ণ হবার সম্ভাবনা থাকে; বাংলা আধুনিক কবিতার বিশিষ্ট প্রয়োজনেই সম্পূর্ণ হওয়া দরকার। যাঁরা জানাবেন তাঁরা রচনাগুলির পূর্ণ ও নিষ্ঠ অনুলিপি বা কোথায় তা পাওয়া যাবে, তার সন্ধান, জানান যদি আমাদের, তবে তাঁদের প্রতি পত্রিকা মারফৎ ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে আমরা তা মুদ্রিত করতে পারি। পরিশেষে নিখিল পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ, তাঁরা এ-প্রসঙ্গে সহৃদয় এবং ঐকান্তিক হোন॥

সুচরিতা দাশ

ভূমেন্দ্র গুহ

॥ ময়ূখ ॥

* দ্বৈ-মাসিক কবিতা-পত্র। বছরের ছয় ঋতুতে প্রকাশিত হয়। বর্ষারম্ভ শরতে।
  যে-কোনো সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি সংখ্যার দাম আট আনা। বার্ষিক গ্রাহক-মূল্য সডাক তিন টাকা মাত্র। ষাণ্মাসিক গ্রাহক করা হয় না।
* তরুণতম লেখকদের কবিতা, কবিতা-সম্পর্কিত আলোচনা বা প্রবন্ধ সাদরে গৃহীত হয়। উপযুক্ত ডাক-টিকিট সঙ্গে থাকলেই মতামত জানানো সম্ভবপর।
* সমালোচনার জন্যে দু'কপি ক'রে বই পাঠানো বাঞ্ছনীয়।
* নমুনা-সংখ্যার জন্যে দশ আনার ডাক-টিকিট পাঠাতে হবে।

* যাবতীয় রচনাদি ও চিঠিপত্র "সমর চক্রবর্তী, যুগ্ম-সম্পাদক, 'ময়ূখ'" এই নামে কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

* এই সংখ্যা থেকে বিজ্ঞাপন নেওয়া হচ্ছে; বিজ্ঞাপন-সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয় নিম্নোক্ত ঠিকানায় পত্রালাপ করলে জানা যাবে।

যাবতীয় টাকাকড়ি, চেক-ও এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে:

ভূমেন্দ্র গুহ
২৯ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলকাতা ১২।

কার্যালয়:
২৩।১ চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ)
কলকাতা ২৫।

দেড় টাকা